অধ্যায় ১১

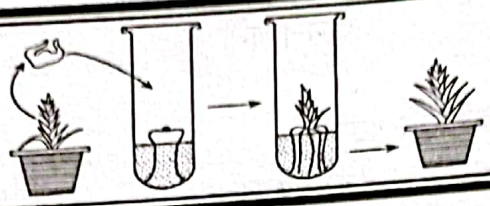

জীবপ্রযুক্তি
Biotechnology

প্রধান শব্দাবলি

- বায়োটেকনোলজি
- টিস্যু কালচার
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
- জিনোম সিকোয়েন্সিং
- ট্রান্সজেনিক
- ইনসুলিন

আধুনিককালে **জিন প্রযুক্তির** (genetic engineering) কলা কৌশল জীবপ্রযুক্তিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে ও জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জীবপ্রযুক্তি মানব সভ্যতার বিকাশে ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভূত সম্ভাবনার পথ উন্মোচিত করেছে।

বায়োটেকনোলজি বা **জীবপ্রযুক্তি** শব্দটি ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী **কার্ল এরেকি** (Karl Ereky)। Biology এবং Technology শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology শব্দটি। মাধ্যমিক শ্রেণিতে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হায়েছে। এ অধ্যায়ে জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপসমূহ
- জিন ক্লোনিং এর ব্যাখ্যা
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি
- জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রয়োগ
- জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা
- জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	জীবপ্রযুক্তি
পাঠ ২ ও ৩	টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার
পাঠ ৪	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
পাঠ ৫	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
পাঠ ৬	জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ৭	জিন ক্লোনিং
পাঠ ৮	প্রাণীর ক্লোনিং কৌশল
পাঠ ৯	জিন অনুক্রম
পাঠ ১০	জীব নিরাপত্তা

বর্তমান বিশ্বউন্নয়ন হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যত বেশী উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, চিকিৎসা, যোগাযোগ, আত্মমর্যাদা ও শক্তিতে ততটা উন্নত। সব প্রযুক্তি আবার জীবপ্রযুক্তির আওতায় আনা যাবে না– যেমন মাটি দিয়ে ইট তৈরী, মাটির গভীর থেকে তেল, গ্যাস উঠানো, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, মোবাইল ফোনের (গুগল, ইউ-টিউব) বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে নানাবিধ অসাধ্য সাধন ইত্যাদি সবই প্রযুক্তির ব্যবহার। কিন্তু এগুলো জীবপ্রযুক্তি নয়।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কিছু জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে তা'হলো– দুধ থেকে দই, পচাগলা খাবার থেকে অ্যালকোহল, মাখন থেকে ভিনেগার, আটা থেকে পাউরুটি তৈরী হয় ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াকৌশলেই। এ সব প্রযুক্তিকে **পুরনো জীবপ্রযুক্তি** (Old Biotechnology) বলে। সাম্প্রতিককালে একখন্ড ভাজক টিস্যু থেকে কোটি কোটি চারা তৈরী, ইনসুলিন তৈরী, এগুলো **নতুন জীবপ্রযুক্তি**, (New Biotechnology)। ১৯৭০ দশকে **রিকম্বিনেট DNA প্রযুক্তি** উদ্ভাবন জীবপ্রযুক্তিকে নতুন মাত্রায় আকর্ষণীয় করেছে।

CamScanner

জীবপ্রযুক্তি কী ?

কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে, **জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি।**

জীবপ্রযুক্তির আরো কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো :

i. **মানব কল্যাণে জীবের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের কলা-কৌশলকে জীবপ্রযুক্তি বলে।**

ii. স্পিংকস (Spinks, 1980)- এর মতে, **শিল্প কারখানায় পণ্য উৎপাদনের এবং ব্যবহারের জন্য জৈবিক পদ্ধতি বা অণুজীবের ব্যবহারই হচ্ছে জীবপ্রযুক্তি** (biotechnology)।

iii. US National Science Foundation অনুযায়ী, **জীবপ্রযুক্তি হলো মানুষের কল্যাণার্থে অণুজীব কিংবা অপর কোনো কোষীয় জীবসত্তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।**

iv. Euroapen Federation of Biotechnology প্রদত্ত সংজ্ঞাটি– **জীবপ্রযুক্তি হলো জীব বা জীব উপজাত পদার্থের ব্যবহারিক বা শিল্পভিত্তিক প্রয়োগ।**

জীবপ্রযুক্তি ও তার বিভিন্ন দিক (Biotechnology and Its Various Disciplines)

বর্তমানে জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজির পরিধি আরও বিস্তার লাভ করেছে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে জীবপ্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো–

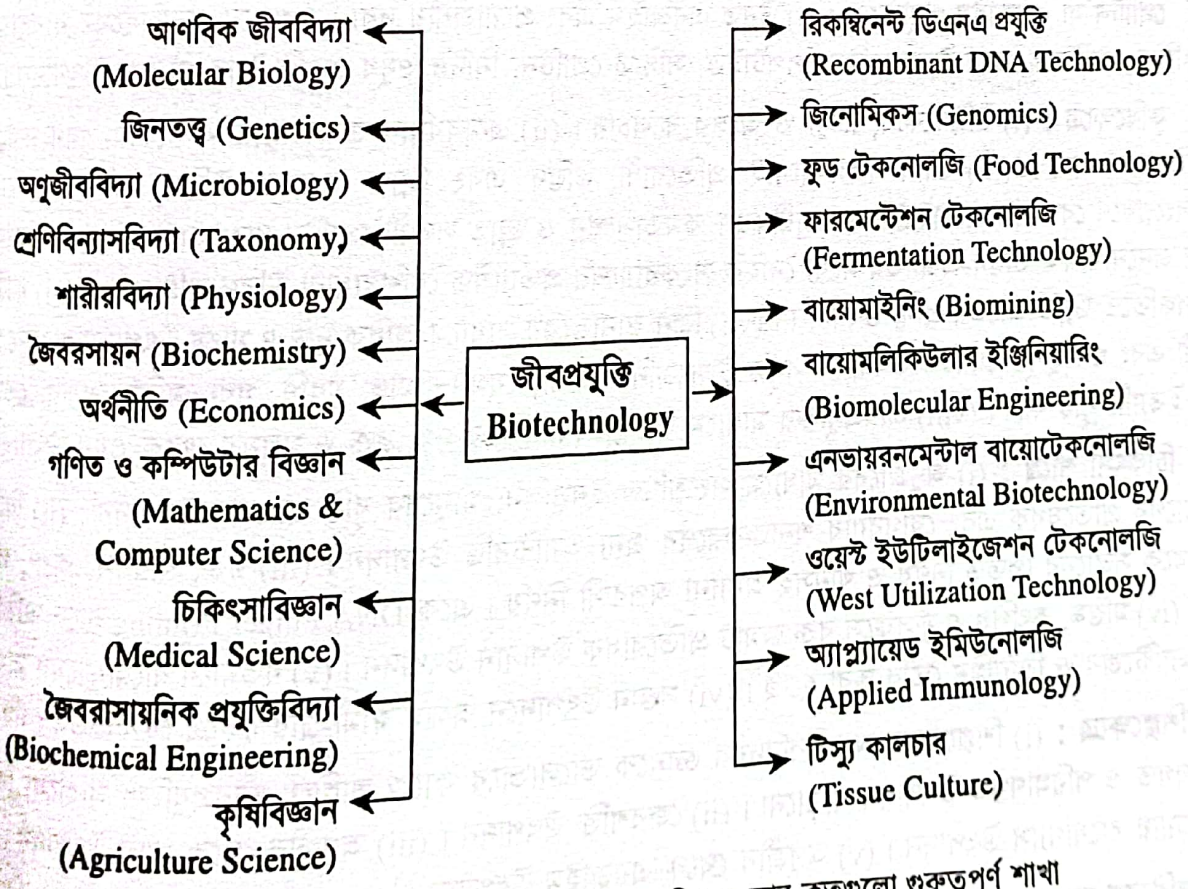

চিত্র ১১.১ : জীবপ্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) ও তার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শাখা

জীবপ্রযুক্তির পরিধি (Scope of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি ক্রম সম্প্রসারণশীল ফলে দিনদিন এর পরিধি বেড়েই চলেছে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পুরো বিশ্বের সভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করবে জীবপ্রযুক্তি। বর্তমানে জীবপ্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়।

CamScanner

i. **সবুজ জীবপ্রযুক্তি বা গ্রিন বায়োটেকনোলজি (Green Biotechnology) :** কৃষিক্ষেত্রে সুফলদায়ী জীবপ্রযুক্তি। যেমন–Bt বেগুন ও Bt তুলা ইত্যাদি।

ii. **লাল জীবপ্রযুক্তি বা রেড বায়োটেকনোলজি (Red Biotechnology) :** চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত জীবপ্রযুক্তি। যেমন– জিন থেরাপি কিংবা DNA ভ্যাকসিন।

iii. **নীল জীবপ্রযুক্তি বা ব্লু বায়োটেকনোলজি (Blue Biotechnology) :** জলজ ও সামুদ্রিক জীবের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত জীবপ্রযুক্তি। যেমন– ট্রান্সজেনিক মাছ উৎপাদনের সাহায্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

iv. **ধূসর বা শ্বেত জীবপ্রযুক্তি (Grey or White Biotechnology) :** শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত জীবপ্রযুক্তি। যেমন– কারখানায় মদ উৎপাদন, ভিনেগার তৈরি বা চিজ উৎপাদন প্রভৃতি।

জীবপ্রযুক্তির অবদান বা গুরুত্ব (Importance of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি মানবজীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। মানব সভ্যতার বিকাশে এবং বিভিন্ন শাখায় প্রতিনিয়ত অবদান রেখে যাচ্ছে জীবপ্রযুক্তি। এর উল্লেখযোগ্য বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. **জিন প্রযুক্তিতে :** (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষসহ) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) DNA প্রোবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জিনগত রোগ শনাক্তকরণ ও নিরাময় করা। (iii) বিভিন্ন টিউমার কোষকে ধ্বংস করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ। (iv) বিভিন্ন জীবাণুকে **জীবাণু অস্ত্র** হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার জিনপ্রযুক্তির অন্যতম অবদান।

২. **প্রোটিন বা এনজাইম প্রযুক্তিতে :** (i) উন্নত এনজাইম এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার। (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত কৃত্রিম পেপটাইড, সঞ্চিত প্রোটিন, নির্দিষ্ট ওষুধ প্রভৃতি জৈব যৌগের উৎপাদন।

৩. **কৃষিক্ষেত্রে :** (i) উদ্ভিদকোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কালচার। (ii) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় খাদ্যাভাব পূরণ করতে জীবপ্রযুক্তিজাত খাদ্য। (iii) রোগ-পতঙ্গ-বালাই প্রতিরোধী উদ্ভিদ এবং উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা (iv) সালোকসংশ্লেষণে বেশ সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণকারী উদ্ভিদ উৎপাদন। (v) যৌন জননে অক্ষম উদ্ভিদ-প্রজাতির মধ্যে দৈহিক সংকরায়নের প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যধারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা। (vi) কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে উন্নত জাতের প্রাণী উৎপাদন। (vii) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে অধিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনকারী, রোগ প্রতিরোধী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন উৎপাদন সমৃদ্ধ ট্রান্সজেনিক প্রাণী, যেমন– মাছ, মুরগি, গরু, মহিষ, শূকর, ভেড়া, খরগোশ ইত্যাদি সৃষ্টি করা। (viii) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

৪. **চিকিৎসা শাস্ত্রে :** (i) অণুজীবের মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন, মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। (ii) বিভিন্ন জটিল রোগের প্রতিষেধক এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন। (iii) রক্ত, বীর্যরস, অশ্রু, লালা ইত্যাদি থেকে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয় ও খুনিসহ অন্যান্য অপরাধী নির্ণয়। একে DNA Finger Printing নামে অভিহিত করা হয়। (iv) মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে বায়োফার্মের মাধ্যমে হরমোন অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরি করা হচ্ছে। (vi) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে টেস্টটিউব বেবি।

৫. **শিল্পক্ষেত্রে :** (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদন বাড়ানো। (ii) জৈবশক্তি উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন। (iv) গাঁজন প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস উৎপাদন। (v) অণুজীব থেকে এনজাইম উৎপাদন।

৬. **পরিবেশ রক্ষায় :** (i) কলকারখানায় নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজীবের ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও পরিবেশ নির্মল করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) অণুজীব থেকে বায়ুদূষণ রোধে **জৈব ছাঁকনি** (biofilters), উপাত্ত সংগ্রহকারী জৈব সংবেদক (biosensors) এবং কম্পিউটারের জন্য জৈব চিপস (biochips) উৎপাদন করা হয়। (iv) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

CamScanner

উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant Tissue Culture)

উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন–শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা বা পাপড়ি ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন করা কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত (sterile) অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ (এবং পূর্ণাঙ্গ চারাউদ্ভিদ সৃষ্টি) করাকে **টিস্যু কালচার** বলে। অর্থাৎ **গবেষণাগারে কোনো টিস্যুকে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করাই হলো টিস্যু কালচার।** আমেরিকান জীববিজ্ঞানী **Morgan** (1901) এর মতে সব সজীব উদ্ভিদকোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে। এ ক্ষমতাকে তিনি **টটিপোটেন্সি** (totipotency) বলে অভিহিত করেন। এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় এজন্য একে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** বলে। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন প্রজন্ম বা **ক্লোন** (clone) তৈরি করা হয় বলে একে **ক্লোন প্রযুক্তিও** বলা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে (সজীব অঙ্গ, কোষ, মেরিস্টেম, পরাগরেণু, ভ্রূণ, নিউসেলাস, ডিম্বক ও স্পোর) পৃথকীকৃত অংশকে **এক্সপ্লান্ট** (explant) বলে। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে বলে **অণুচারা** (plantlet)। **জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt** (1902)-**কে টিস্যু কালচারের জনক বলা হয়।** কারণ তিনিই সর্বপ্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিকে **In-vitro কালচার**ও বলা হয়। কারণ এ প্রক্রিয়াটি কাঁচপাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

১৯৩০-এর দশকে ফরাসি বিজ্ঞানী **Gautheret** (1939), আমেরিকান বিজ্ঞানী **White** (1939) এবং অপর একজন ফরাসি বিজ্ঞানী **Nobercourt** (1939) পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের টিস্যু নির্দিষ্ট পুষ্টি মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভাবে আবাদ করতে সক্ষম হন। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত উদ্ভিদ প্রকরণ উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

❐ **টিস্যু কালচার গবেষণাগার (Tissue Culture Laboratory) :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ল্যাবরেটরি আবশ্যক, যেখানে তিনটি কক্ষ থাকে।

১. যার একটিতে সাধারণ কার্যক্রম (যেমন–মিডিয়াম প্রস্তুতকরণ, অটোক্লেভ করা, সংগৃহীত উদ্ভিদাংশ পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি) সম্পন্ন করা হয়।

২. ল্যামিনার ফ্লো সমন্বিত ইনোকুলেশন চেম্বার, যেখানে কালচার উপযোগী অংশগুলো জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কালচার ভেসেলে (তৈরিকৃত কৃত্রিম নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়ামে) প্রবিষ্ট করানো হয়।

৩. কালচার চেম্বার যেখানে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোক তীব্রতা, আলোককাল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং এ নিয়ন্ত্রিত কালচার পরিবেশে কালচার ভেসেল সংরক্ষিত থাকে, যা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কালচারকৃত উদ্ভিদাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

❐ **টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ**

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ওয়াশিং বাকেট, হট এয়ার ওভেন, রেফ্রিজারেটর, ব্যালান্স, pH মিটার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, অটোক্লেভ, মাইক্রোস্কোপ, ল্যামিনার এয়ার ফ্লো-কেবিনেট, মাইক্রোটোম, স্যাকার, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, ব্রেডার ইত্যাদি।

কাঁচের উপকরণ : টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্ল্যাস্ক, আয়তনিক ফ্ল্যাস্ক, বোতল, পেট্রিডিস, মাপচোঙ, পিপেট, খাঁজযুক্ত কাঁচদণ্ড, স্লাইড ইত্যাদি।

রাসায়নিক দ্রব্য : পুষ্টি মাধ্যমের (culture medium) জন্য বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ, হরমোন (অক্সিন), অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, পেপটোন, চারকোল, ইস্ট, অ্যালকোহল, স্পিরিট, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি।

অন্যান্য উপকরণ : কাঁচি, চিমটা, সার্জিক্যাল ব্লেড, সিকেটিয়ার, স্পেচুলা, ফিল্টার পেপার, প্লাস্টিকের পাত্র, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, টিস্যু পেপার, মাস্ক, হ্যান্ডগ্লোবস ইত্যাদি।

জীবাণুমুক্ত পরিবেশ : টিস্যু কালচারের জন্য সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন।

এক্সপ্লান্ট জীবাণুমুক্তকরণ : প্রথমে পাতিত পানিতে ধৌতকরণ তারপর মারকিউরিক ক্লোরাইডযুক্ত পানিতে ধুয়ে নিতে হয়।

কাঁচের উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ : ভালোভাবে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে শুকানো হয়।

কালচার মিডিয়াম জীবাণুমুক্তকরণ : কাঁচ পাত্রসহ কালচার মিডিয়াম ওভেনে ১৬০°–১৮০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১–২ ঘন্টা রেখে নিবীজ (sterillize) করা হয়।

ফরসেপস, নিডল স্কালপেল : বার্ণারে গরম করে তারপর ৯৫% অ্যালকোহলে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

* মাস্ক, টিস্যু, হ্যান্ডগ্লোবস–এগুলো একবার ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার না করাই ভাল।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ

টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে: যেমন– কক্ষমুকুল কালচার (axillary bud culture), মেরিস্টেম কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, ক্যালাস কালচার-এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন (somatic embryogenesis), পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার ইত্যাদি।

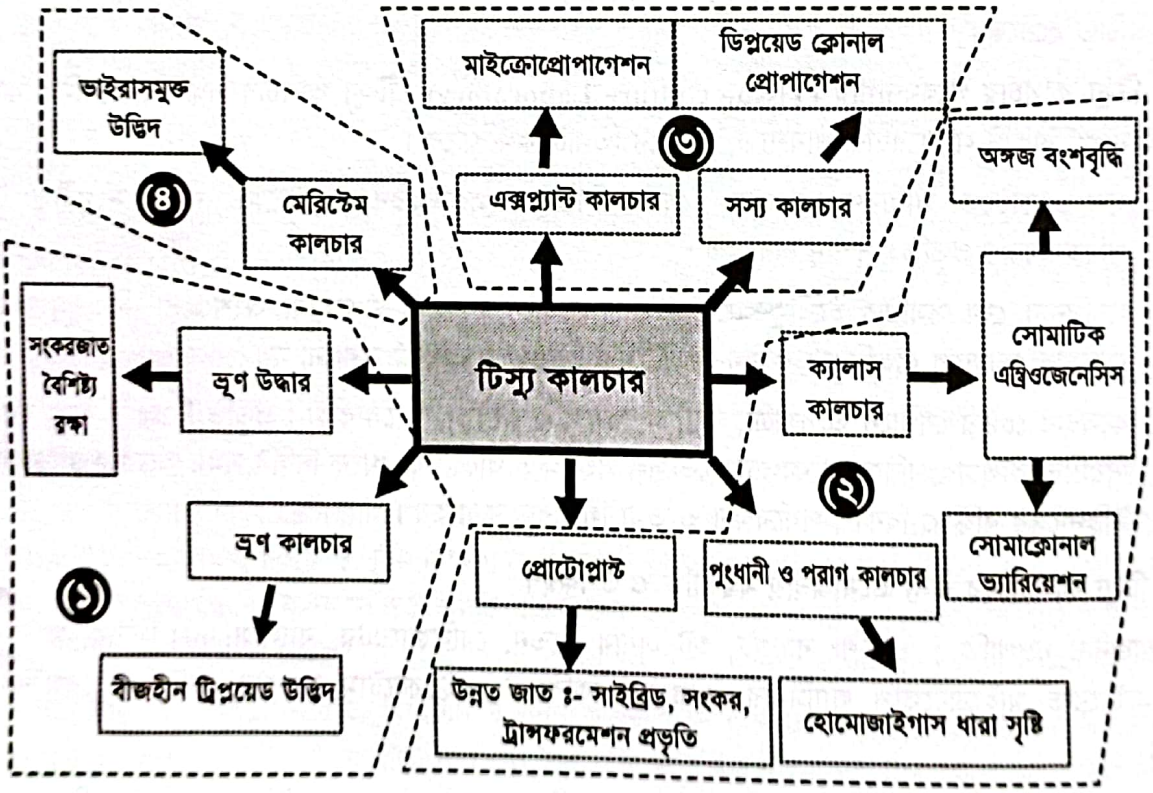

চিত্র ১১.২ : বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ টিস্যু কালচার

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ (Steps of Tissue Culture Technique)

নিচে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১. মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন বা এক্সপ্লান্ট নির্বাচন (Explant Selection) : যে উদ্ভিদ থেকে এক্সপ্লান্ট নেয়া হয় বা হবে সেই উদ্ভিদকে **মাতৃউদ্ভিদ** বলে। টিস্যু কালচারের জন্য উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ মাতৃউদ্ভিদ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত টিস্যুকে **এক্সপ্লান্ট** বলে। সাধারণত কোনো ভাজক কোষ, মেরিস্টেম, পরাগরেণু ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

২. কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি (Preparation of Culture Medium) : উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যেসব রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়ে **আবাদ মাধ্যম** বা **কালচার মিডিয়াম** বা **পুষ্টি মাধ্যম** প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মুখ্য ও গৌণ উপাদান, ভিটামিন, সুক্রোজ (২–৪%), ফাইটোহরমোন, অ্যাগার অ্যাগার ইত্যাদির মাধ্যমে এ মিডিয়াম তৈরি করা হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : বর্তমানে টিস্যু কালচারে MS মিডিয়াম (Murashige & Skoog, 1962) ও বি-৫ মিডিয়াম (Gamborg *et al.*, 1968) অধিক ব্যবহৃত হয়। যে আবাদ মাধ্যম মৌলিক পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ তাকে **ব্যাসাল মিডিয়াম** বলে। মিডিয়ামের pH সাধারণত 5.5 - 5.8 এর মধ্যে রাখা হয়। ব্যাসাল মিডিয়ামের প্রধান উপাদান হচ্ছে– (i) মুখ্য ও গৌণ পুষ্টি উপাদান, ভিটামিন ও কিছু জৈব যৌগ; (ii). কার্বনের উৎস হিসেবে শর্করা, যেমন– গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ (2-8%), মল্টোজ; ফাইটোহরমোন (বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য, যেমন– অক্সিন) ও (iii) জমাট বাঁধার উপাদান হিসেবে অ্যাগার (agar)]

৩. পুষ্টি মাধ্যম জীবাণুমুক্তকরণ বা নির্বীজকরণ (Sterilization) : পুষ্টি মাধ্যমে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। তাই কালচার করার পূর্বে এ মিডিয়ামকে কাঁচের পাত্রে নিয়ে যেমন– টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাক্স জীবাণুমুক্ত করা হয়। কালচারে ব্যবহৃত এক্সপ্লান্টকেও জীবাণুমুক্ত করা হয়। মিডিয়ামকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্টটিউবে ঢেলে নির্বীজকৃত তুলা দিয়ে পাত্রের মুখবন্ধ করে দেয়া হয় যাতে বায়ু ঢুকতে না পারে। **অটোক্লাভ** (autoclave) যন্ত্রে ১২১° সে. তাপমাত্রায়

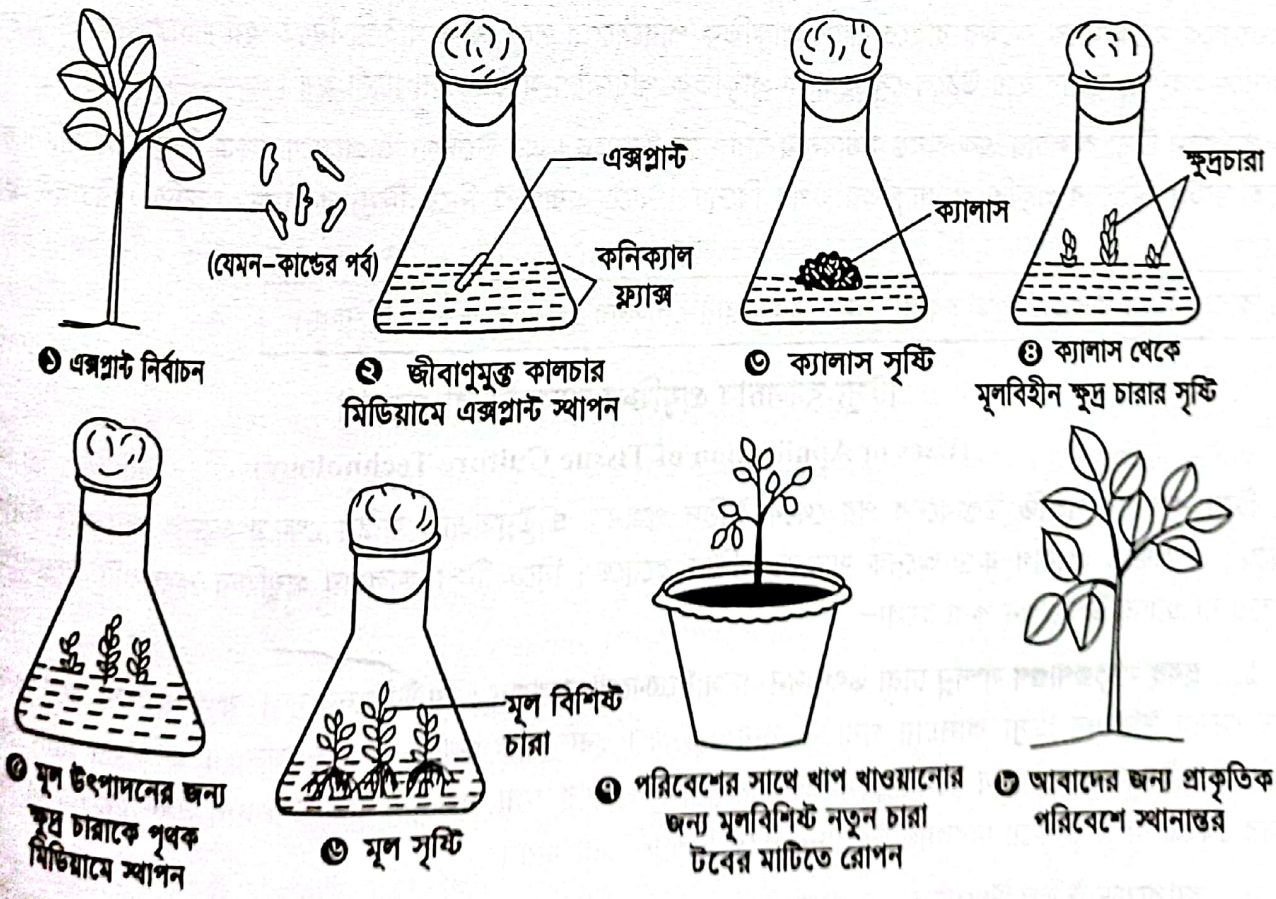

চিত্র ১১.৩ : টিস্যু কালচার প্রযুক্তির পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ

CamScanner

এবং ১৫ lb বায়ুচাপে, ২০ মিনিট রেখে এদের জীবাণুমুক্ত করা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট থেকে অণুচারা তৈরির পদ্ধতিকে ইন-ভিট্রো কালচার বলে।

৪. মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট বা টিস্যু স্থাপন (Explant Transfer into Culture Medium) : জীবাণুমুক্ত এক্সপ্লান্টকে **ল্যামিনার এয়ার ফ্লো** (laminer air flow) এর সামনে জীবাণুমুক্ত মিডিয়ামে স্থাপন করা হয়, যাতে এক্সপ্লান্ট স্থাপনের সময় কাচপাত্রে জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে। এ সময় প্রয়োজনীয় চিমটা, ছুরি, কাঁচি, হাত ইত্যাদি অ্যালকোহল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৫. ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি (Callus Formation and Multiplication) : মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট স্থাপনের পর পাত্রটির মুখ বন্ধ করে নির্দিষ্ট আলো (৩,০০০ – ৫,০০০ লাক্স), তাপমাত্রা (১৭–২০° সে.) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৭০ – ৭৫%) একটি নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয় এবং ১৪/১০ ঘন্টা **আলোক-অন্ধকার চক্র** নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কয়েকদিন পর টিস্যুটি বারবার বিভাজিত হয়ে একটি বহুকোষীয় মণ্ডে পরিণত হয়। অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ হলো মণ্ড। এক্সপ্লান্ট মিডিয়ামে স্থাপন করার পর আলো ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখলে যে অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ সৃষ্টি হয় তাকে **ক্যালাস** (callus) বলে। ৫–৭ দিনের মধ্যে ক্যালাস থেকে অসংখ্য **মুকুল** বা **অণুচারা** সৃষ্টি হয়।

৬. মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন (Transfer of Rooting Medium and Production of Plantlet) : ক্যালাস থেকে উৎপাদিত মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুলে, মূল সৃষ্টি হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ চারায় পরিণত হয়।

৭. চারা টবে স্থানান্তর (Transfer of Plantlet to Pot) : মূল, কাণ্ড ও পাতাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে সাবধানতার সঙ্গে টবের মাটিতে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৮. প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর (Transfer Plantlet to Natural Environment) : টবের চারাগুলোকে মাঝে মাঝে কক্ষের বাইরে রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। চারাগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে সহনীয়, সজীব হয়ে উঠলে সেগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

বর্তমানে টিস্যু কালচার এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ ক্ষেত্র ভিন্ন হলে প্রক্রিয়ারও ভিন্নতা ঘটে। উদ্ভিদের প্রকৃতি ও আকৃতির উপর বিবেচনা করে এক্সপ্লান্ট নিয়ে টিস্যু কালচার পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়।

কাজ : টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ ক্রমধারায় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার বা প্রয়োগ
(Uses or Application of Tissue Culture Technology)

টিস্যু কালচার পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর থেকে উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিচে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার বা গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো–

১. হুবহু মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন চারা উৎপাদন বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন : যে উদ্ভিদের ফুল, ফল বা শস্য গুণে ও মানে উন্নত সেসব উদ্ভিদের টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার করে হুবহু মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন অসংখ্য অতিক্ষুদ্র চারা তৈরির পদ্ধতিকে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** বলে। যেসব উদ্ভিদে (যেমন–সাগর কলা, Thuja) বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় না, এ পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে চারাগাছ উৎপাদন করে বিপণন করা যায়।

২. হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন : পরাগরেণু এবং পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে **অ্যাম্ব্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ** উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন–চীন দেশের **গুয়ান-১৮** (Guan-18, অ্যাম্ব্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড ধান) ও **জিনঘুয়া-১**

CamScanner

(Ginghua-1, অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড গম) হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব এবং তা থেকে সহজেই ইপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের ৫০টির অধিক প্রজাতির হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এরূপ উদ্ভিদে সহজে প্রচ্ছন্নধর্মী মিউটেশন প্রকাশ পায়।

৩. **রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। আলু, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৪. **চারা উৎপাদন :** যে সব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারা গাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

৫. **বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণে :** বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারেই সম্ভব। যেমন–সাইলোটাম।

৬. **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন :** টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** সৃষ্টি করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য নতুন জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে কোনো আবাদী কোষ বা টিস্যু থেকে সৃষ্ট প্রকরণকে **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** বলা হয়। Adh I নামক গম হলো সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের উদাহরণ। এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আবাদী গ্যামেট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে **গ্যামেটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** বলা হয়।

৭. **অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটিমাত্র উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ থেকে অল্প সময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ (প্রায় ১০ লক্ষ) চারা উৎপাদন সম্ভব।

৮. **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন :** প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষে প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ কোষ বা ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** সৃষ্টি করা যায়। পতঙ্গরোধী, আগাছানাশকরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলি উদ্ভিদ যেমন– আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, স্বর্ণধান ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক অভিনব বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

৯. **ভ্রূণ উদ্ধার :** দুটি ভিন্ন প্রজাতির সংকরায়নে সৃষ্ট F_1 অপত্য প্রায়শই বন্ধ্যা হয়। এমন বন্ধ্যা উদ্ভিদের ভ্রূণ গঠিত হলে তা মারা যায় বা তা থেকে কোনো বীজ উৎপন্ন হয় না। এমন সংকর উদ্ভিদ থেকে ভ্রূণ উদ্ধার করে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করে (culture medium) স্বতন্ত্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।

উদাহরণ : **পাট** – *Corchorus olitorius* × *C.capsularis*
ধান– *Oryza sativa* × *O.officinalis*
টমেটো- *Lycopersicon peruvianum* × *L.lycopersicum*
শিম- *Phaeseolus vulgaris* × *P.angustissimus*

সম্পর্কবিহীন উদ্ভিদেও ভ্রূণপালনের মধ্যে সংকর উদ্ভিদ তৈরি সম্ভব হয়েছে, যথা– *Triticum aestivum* × *Hordeum vulgare*।

১০. **দ্রুত ক্লোন সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবিস্তার :** একই দাতা উদ্ভিদের কোষ নিয়ে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অসংখ্য উদ্ভিদ ক্লোন তৈরি করা যায়। এভাবে সুন্দর ফুলদায়ী অনেক অর্কিড প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

CamScanner

১১. দেহজ ভ্রূণ সৃষ্টি : এ পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক একেকটি দেহকোষ থেকে পুষ্টি মাধ্যমে একেকটি ভ্রূণ সৃষ্টি করা যায়। গাজর, আলফা-আলফা প্রভৃতি গাছের এ প্রক্রিয়ায় অল্প জায়গায় অসংখ্য ভ্রূণ তৈরি করা যায়।

১২. সাইব্রিড উৎপাদন : প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের মাধ্যমে এমন সংকর বংশধর উৎপন্ন করা সম্ভব যাদের কোষে সাইটোপ্লাজমের মিশ্রণ ঘটলেও নিউক্লিয়াস দুটি পৃথক থাকে, এরূপ সংকর উদ্ভিদকে **সাইব্রিড** বলে। সাইব্রিড প্রযুক্তিতে এক উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়া অপর উদ্ভিদে সন্নিবেশিত করা সম্ভব। আলু, টমেটো, পিটুনিয়া, তামাক, লেবু ইত্যাদি উদ্ভিদে সাইব্রিড সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন– আলু ও টমেটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে **পোমাটো** নামক সাইব্রিড উদ্ভিদ সৃষ্টি। সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশনের ধাপগুলো হলো–

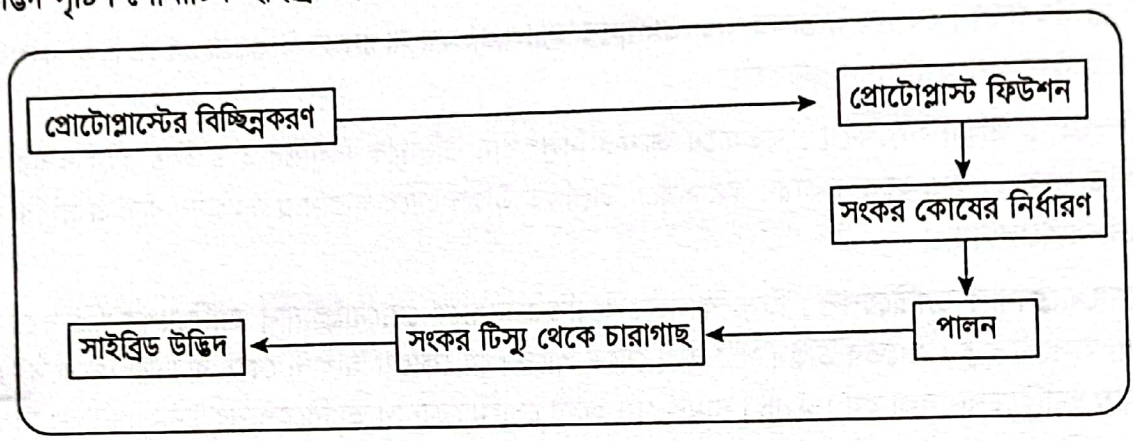

১৩. মেরিস্টেম কালচার : মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে **মেরিস্টেম** বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোনো রোগ-জীবাণু থাকে না।

১৪. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : মালয়েশিয়ায় **Oil palm**- এর টিস্যু কালচার করা হচ্ছে। এ দেশটি পাম তেল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিভিন্ন দেশে অর্কিডের টিস্যু কালচার করা হয় এবং অর্কিড ফুল রফতানি করে এসব দেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

১৫. সেকেন্ডারি বিপাকীয় দ্রব্য উৎপাদন : টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে কালচারকৃত বিভিন্ন কোষ, টিস্যু বা ক্যালাস থেকে অ্যালকালয়েড, টারপিনয়েড, ফিনাইল প্রোপিনয়েড ইত্যাদি সেকেন্ডারি বিপাকীয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

১৬. অন্যান্য : Jojoba (*Simmondsia* sp.) থেকে প্রাপ্ত তেল বিভিন্ন ইঞ্জিন চালানো ও কসমেটিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এ গাছকে ভারতবর্ষের জলবায়ু উপযোগী ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচারের কাজের সূত্রপাত হয়। ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেমন– ব্র্যাক, প্রশিকা, আলফাএগ্রো, প্রোটিন ফুড প্রভৃতিতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রসার লাভ করে এবং এসব প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে তা কাজে লাগাচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের উদ্ভিদ উন্নয়নে এ প্রযুক্তির কিছু সাফল্য উল্লেখ করা হলো–

১. **অর্কিডের চারা উৎপাদন :** বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

২. **ফুল ও শোভাবর্ধনকারী গাছের চারা সৃষ্টি :** গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান, লালপাতা ইত্যাদি।

৩. **কাঠ উৎপাদনকারী গাছের চারা সৃষ্টি :** কদম, জারুল, ইপিল-ইপিল, বকফুল, মেহগনি, সেগুন, নিম, আকাশমনি, কেলিকদম ইত্যাদি।

CamScanner

৪. **ফল উৎপাদনকারী গাছের চারা সৃষ্টি :** কলা, তরমুজ, কাঁঠাল, বেল, স্ট্রবেরি ইত্যাদি।

৫. **রোগ প্রতিরোধক্ষম কলার চারা উৎপাদন :** বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কলার চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এ রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।

৬. **ফসল :** বিভিন্ন প্রকার ডালজাতীয় ফসল (মুগ, কলাই, মাষ কলাই) ও বাদামের টিস্যু কালচার করে চারা উৎপাদন করা হচ্ছে।

৭. **তন্তু উৎপাদন :** পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।

৮. **রোগমুক্ত সব্জি উৎপাদন :** টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোলআলুর রোগমুক্ত বীজ **মাইক্রোটিউবার** উৎপাদন।

৯. **সুইটনারের ব্যবহার :** স্টেভিয়ার পাতা চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্র্যাক *Stevia* এর চারা উৎপাদন করছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : উন্নতমানের বেলের চারা উৎপাদন, শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষ উপযোগী চারা উৎপাদন, কম সময়ে বর্ধনশীল ও অধিকতর কাঠ উৎপাদনকারী আকাশ মনি চারা উৎপাদন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : উন্নতমানের গোল মরিচের চারা ও উন্নতমানের কাঁঠালের চারা উৎপাদন; এছাড়া রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার উৎপাদন, গোলাপ, লালপাতা, নানা ধরনের অর্কিড, মেহগনি, কেলিকদম, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : মুগ ও মাষকলাই এর রোগ প্রতিরোধী জাতের চারা উৎপাদন, দেশি বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ
(Advantage and Disadvantage of Tissue Culture Techniques)

নিচে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো–

সুবিধাসমূহ

১. অল্প জায়গায় অধিক চারা উৎপাদন।
২. উদ্ভিদের যেকোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন।
৩. একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ থেকে অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন।
৪. নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাতৃউদ্ভিদের প্রজাতিগত চারিত্রিক গুণাবলি অক্ষুণ্ন রেখে চারা উৎপাদন।
৫. সহজে রোগমুক্ত বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন।
৬. ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়া।
৭. কলমে অক্ষম ও বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না এমন উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
৮. বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও ঐ প্রজাতিকে সংরক্ষণ।
৯. বিদেশি জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশি আবহাওয়ায় উপযোগী জাত সৃষ্টি করা।
১০. সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুদ করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা।
১১. অতি স্বল্পমূল্যে বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন।

অসুবিধাসমূহ

১. মূল্যবান যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক উপকরণ ও ব্যয়বহুল গবেষণাগারের অভাব।
২. বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব।
৩. গবেষণাগারে আবাদ টিস্যু জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে টিস্যু কালচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।
৪. টিস্যু কালচারের ফলে উৎপন্ন চারা ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় জীবনীশক্তি কম।

CamScanner

৫. প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন চারার মূল্য অনেক বেশি পড়ে।
৬. প্রজননগত সমস্যার কারণে দেরিতে ফল আসা উদ্ভিদের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া।
৭. উৎপাদিত চারা সঠিক সময়ে বিক্রি না হওয়া।
৮. অঙ্গজ প্রজননের ফলে উদ্ভিদের কোনো নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয় না।

জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
(Genetic Engineering and Recombinant DNA Technology)

বংশগতির যে শাখায় জিনের পৃথকীকরণ, সংযোজন ও বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করে তাকে জিন প্রকৌশলবিদ্যা বলে। বর্তমান বিশ্বে এ শাখা নবীনতম ও প্রয়োগমুখী শাখা। এর মূল লক্ষ কোনো কাঙ্ক্ষিত 'জিন' স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নতমানের নতুন জীব প্রকরণ সৃষ্টি করা। **কোনো জীবকোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্যকোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়।** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের জীবকে বলা হয় **GMO** (Genetically Modified Organism) বা **GEO** (Genetically Engineered Organism) বা **ট্রান্সজেনিকস** (TO = Transgenic Organism)। মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়াতে (*E.coli*) প্রবেশ করিয়ে এখন ঐ সমস্ত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনসুলিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সায়েন্স ফিকশন লেখক **Jack Williamson** তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Dragon's Island এ সর্বপ্রথম Genetic Engineering শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৭২ সালে **James, Symon** ও **Berg** নামক তিনজন বিজ্ঞানী দুটি ভিন্নসূত্র থেকে DNA খণ্ড একত্রে জোড়া লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করে **রিকম্বিনেন্ট rDNA** প্রযুক্তির সূত্রপাত করেন। ১৯৭৩ সালে প্রথম GM ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার এবং ১৯৭৪ সালে বিশ্বের প্রথম ট্রান্সজেনিক প্রাণী GM ইঁদুর সৃষ্টি করা হয়।

একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে নিয়ে অন্য জীবের কোষের DNA এর সাথে লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করার ফলে যে নতুন (মিশ্রিত) DNA উৎপন্ন হয় তাকে Recombinant DNA বলে।

যে পদ্ধতিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কার্যাদি সম্পন্ন করা হয় তাকে **রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি** (Recombinant DNA Technology) বা **জিন ক্লোনিং** (Gene Cloning) বলা হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট জিনসহ DNA অণুর অংশকে কোষের বাইরে ছেদন করে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে গঠিত নতুন জিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়। একে **জিন ক্লোনিং** বলে। এভাবে ক্লোন করা জিনটি চাহিদা অনুসারে ব্যবহার করা হয়, যেমন– (i). প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং (ii). অন্য কাঙ্ক্ষিত জীবে বিশেষ করে উদ্ভিদে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** উৎপাদন করা। পরবর্তীতে এ জীবে নতুন জিনের বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ও ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন প্রক্রিয়া অণুজীবের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উল্লিখিত অণুজীবসমূহের মধ্যে *E-coli, Agrobacterium tumefaciens* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোজোম ছাড়াও একটি ছোট বৃত্তাকার DNA অণু

CamScanner

থাকে। অতিরিক্ত এই বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় **প্লাজমিড** (plasmid)। প্লাজমিড-এর মাধ্যমে নতুন জিন-এর সন্নিবেশন এবং সন্নিবেশিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

প্লাজমিড (Plasmid) : ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোজোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু থাকে তাকে **প্লাজমিড** বলে। **Laderberg** (1952) *E.coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষে সর্বপ্রথম প্লাজমিডের সন্ধান পান। প্লাজমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে **অনুলিপন** (replicate) করতে পারে। মূল ক্রোমোজোমের বাইরে একটি অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্রাকার DNA(ক্রোমাজোম) হিসেবে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমিড অবস্থিত। এদের সংখ্যা কোষপ্রতি ১-১০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

প্লাজমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. প্লাজমিড **বৃত্তাকার** (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু।
২. এর আণবিক ভর প্রায় 10^6 - 200 x 10^6 dalton.
৩. প্লাজমিড অল্পসংখ্যক জিন ধারণ করে, ক্ষুদ্র ও স্বতন্ত্র।
৪. রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে আদর্শ প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।
৫. এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হতে পারে।
৬. কোনো কোনো প্লাজমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন– colicin, vibriocin ইত্যাদি।
৭. কিছু প্লাজমিড **সেক্স পিলি** তৈরি করে যা কনজুগেশন টিউব তৈরি করে এবং কনজুগেশন ঘটায়।
৮. অন্য প্লাজমিড বা মূল DNA বা অন্য জীবের যে কোনো DNA-এর সাথে পুনঃসমন্বয় করতে সক্ষম।
৯. এদেরকে সহজে পোষক দেহ থেকে পৃথক করা যায়।
১০. প্লাজমিডগুলো **স্ব-বিভাজনক্ষম**।

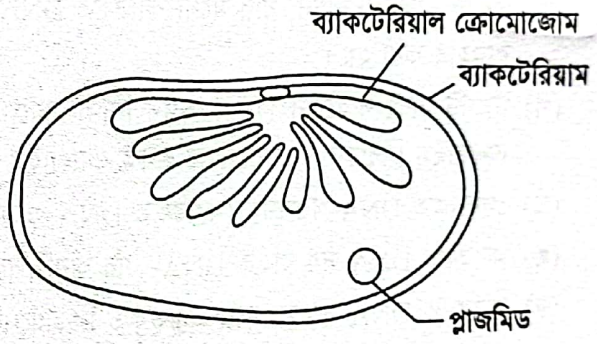

চিত্র ১১.৫ : *Agrobacterium tumefaciens*-এর প্লাজমিড DNA

প্লাজমিডের প্রকারভেদ : ব্যাকটেরিয়ায় প্রাপ্ত প্লাজমিড প্রধানত তিন প্রকার। যথা–

১. **F ও F´- Plasmid বা উর্বর প্লাজমিড :** এরা এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে **জেনেটিক বস্তু** স্থানান্তর করার জন্য দায়ী। এখানে F(Fertility) ও F´ প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার দেহে **সেক্স পিলি** তৈরি করে, যা যৌন জননে তথা কনজুগেশনে সাহায্য করে।

যেমন : *E coli* তে F ও F´- plasmid পাওয়া যায়।

২. **R-Plasmid বা রোধক প্লাজমিড :** এখানে R-হলো Resistance, এতে অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) প্রতিরোধী জিন থাকে। যেমন– Enterobacteriaceae এর R-Plasmid.

৩. **Col-Plasmid :** এতে **কোলিসিন** (colicin) উৎপন্নকারী জিন থাকে। কোলিসিন সংবেদনশীল *E.coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। যেমন– *E-coli* এর Plasmid.

এ ছাড়াও Degradative Plasmid ও Virulance Plasmid পাওয়া যায়।

ডিগ্রেডেটিভ Plasmid : এ ধরনের প্লাজমিডের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ায় টলুইন, স্যালিসাইলিক এসিড ইত্যাদি অস্বাভাবিক উৎপাদনের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– *Pseudomonas putida* এর *Tol-Plamid.*

ভিরুলেন্স-Plasmid : এগুলোকে রোগ সৃষ্টিকারী Plasmid বলে। *Agrobacterium turnefaciens* এর ti-plasmid এর উপস্থিতির ফলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে এ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে Crowngall রোগের সৃষ্টি হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য পোষকগুলো হলো–

- **প্রোক্যারিওটস :** *E.coli* (সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়), *Bacillus subtilis, Agrobacterium tumefaciens* ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া।
- **ছত্রাক :** *Saccharomyces cerevisiae* (ঈস্ট)।
- **ইউক্যারিওটস :** যেকোনো উদ্ভিদ কিংবা প্রাণিকোষ।

প্লাজমিডের ব্যবহার : আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণায় প্লাজমিড ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে এটি উপযোগী **ভেক্টর** (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাজমিড DNA ব্যবহার করে মানুষের ইনসুলিন, ইন্টারফেরন, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (টারগেট DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডটি প্রতিস্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্লাজমিড DNA কে ব্যবহার করা হয়।

(গ) টার্গেট এবং বাহকের DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় **রেস্ট্রিকশন এনজাইম** নির্বাচন। উভয়ক্ষেত্রে একই এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খণ্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) **DNA লাইগেজ** এনজাইম দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA- এর অনুলিপনের জন্য একটি **পোষক** (host) নির্বাচন (যেমন–*E.coli*)।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাজমিড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, রিকম্বিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium*- এ স্থানান্তর করানো।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে কাঙ্ক্ষিত জিনকে *Agrobacterium* দ্বারা স্থানান্তর করানো।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ
(Steps of Genetic Engineering or Recombinant DNA Technology)

কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA অণুর খণ্ডাংশকে আলাদা করে অন্য একটি জীবের DNA অণুর (পোষক DNA অণু) সঙ্গে যুক্ত করে যে নতুন ধরনের DNA অণু তৈরি করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রযুক্তিকেই **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি** বলা হয় এবং এ প্রযুক্তিই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূলনীতি। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সম্পন্নের জন্য নিম্নোক্ত মৌলিক ধাপগুলো অবলম্বিত হয়।

১. দাতা জীব থেকে কাঙ্খিত DNA অণুখন্ড (জিন) আহরণ : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাতা জীব থেকে যখন কাঙ্খিত DNA আহরিত হয় তখন তাকে **প্যাসেঞ্জার DNA** (passenger DNA) বলে।

প্রত্যক্ষ উপায়ে DNA আহরণকালে প্রথমে দাতা জীবের কোষাবরণী ভেঙ্গে **কোষীয় পদার্থ** মুক্ত করা হয়। মুক্ত উপাদান থেকে সম্পূর্ণ DNA কে আলাদা করে **রেস্ট্রিকশন এনজাইম** (যেমন–Eco RI)-এর সাহায্যে কাঙ্খিত DNA

CamScanner

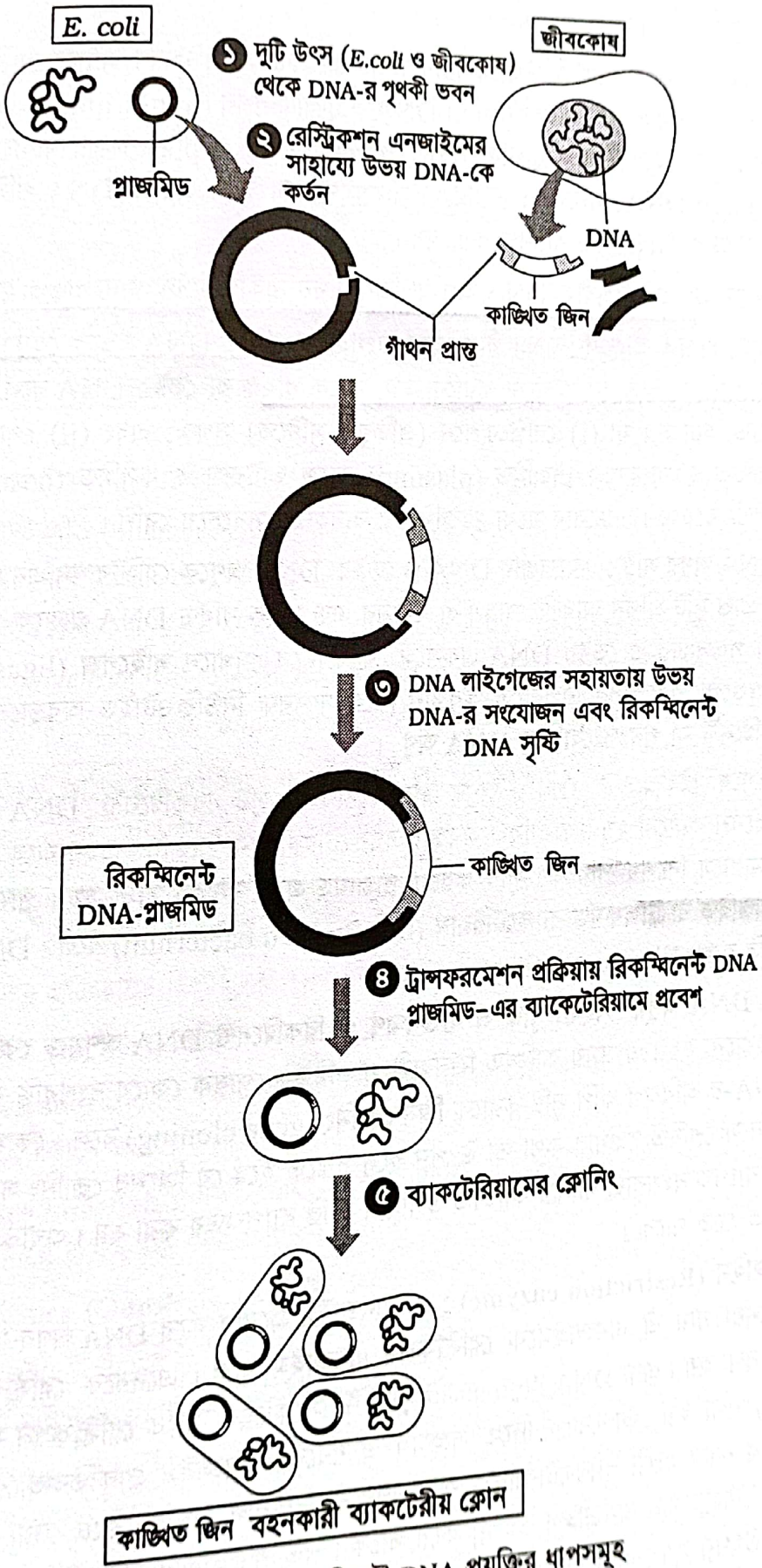

চিত্র ১১.৬ : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ

অণুকে কেটে ছোট খন্ডে পরিণত করা হয়। রেস্ট্রিকশন এনজাইম (restriction enzyme) কেবল DNA অণুর সুনির্দিষ্ট অনুক্রমে ফসফেট বন্ড মুক্ত করে DNA কে খন্ডিত করে।

ইউক্যারিওটিক জীবের ক্ষেত্রে **পরোক্ষ উপায়ে** DNA আহরণ করা হয়। কারণ এখানে অতিদীর্ঘ DNA অণুসূত্র থাকে যা থেকে কাঙ্খিত জিন পৃথক করা দূরুহ ব্যাপার। DNA'র **ট্রান্সক্রিপশন** (transcription)-এর সময় যে mRNA তৈরি হয় তা পৃথক করে তা থেকে **রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ** (reverse transcriptase)–এর মাধ্যমে একসূত্রক সম্পূরক DNA (complementary DNA, সংক্ষেপে cDNA) সংশ্লেষণ করা হয়। এরপর **DNA পলিমারেজ** এনজাইমের সাহায্যে cDNA কে দ্বিসূত্রক DNA তে পরিণত করা হয়।

উপরোক্ত যে কোনো উপায়ে সংগৃহীত DNA অণু বা জিন তখন রিকম্বিনেন্টের জন্য প্রস্তুত হয় ।

২. ভেক্টর (বাহক) DNA আহরণ : দাতা জীব থেকে সংগৃহীত কাঙ্খিত DNA খন্ডকে যে DNA অণুর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পরবর্তীকালে তার সংখ্যা বাড়ানো ও ব্যক্ত করানো হয়, তাকে **বাহক** বা **ভেক্টর** DNA বলে। এমন DNA কে বাহক হিসেবে নির্বাচিত করা হয় যা-(i) রেপ্লিকেশনে (প্রতিরূপ সৃষ্টিতে) সক্ষম; এবং (ii) পোষক কোষে প্রবেশের পর এর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া যায়। **প্লাজমিড** (plasmid), ফাজ ভাইরাস ও কসমিড (cosmid)-এর ক্ষুদ্রাকৃতির DNA তে এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্লাজমিডের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

৩. রিকম্বিনেন্ট DNA অণুর সৃষ্টি : প্যাসেঞ্জার DNA ও ভেক্টর DNA অণুকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে এমনভাবে কেটে নেয়া হয় যেন প্রান্ত দুটি গাঁথন আকৃতি পায়। এ ধরনের এক সূত্রক বর্ধিত DNA প্রান্তকে **গাঁথন প্রান্ত** (sticky ends) বলে। এরপর প্যাসেঞ্জার ও ভেক্টর DNA একসঙ্গে রেখে দিয়ে সেখানে **লাইগেজ** (ligase) এনজাইম প্রয়োগ করলে পরিপূরক প্রান্তগুলো পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে সম্পূরক নিউক্লিওটাইড অবস্থানে জোড়া লেগে যায়। এভাবে সৃষ্টি হয় **রিকম্বিনেন্ট** বা **পুনঃসংযোজিত DNA অণু** ।

৪. পোষক কোষে রিকম্বিনেন্ট DNA অণুর প্রবেশকরণ : সৃষ্ট রিকম্বিনেন্ট DNA অণু একটি পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া অন্য প্লাজমিড গ্রহণ করে না। Ca^{++} সমৃদ্ধ করে Heat Shock এর মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করলে প্লাজমিড গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্লাজমিড গ্রহণ করলে ঐ ব্যাকটেরিয়ামকে **রূপান্তরিত** বা **ট্রান্সফর্মড ব্যাকটেরিয়াম** (transformed bacterium) বলে। DNA অণুপ্রবেশের অন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো Electroporation.

৫. রিকম্বিনেন্ট DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তকরণ : রিকম্বিনেন্ট DNA অণুযুক্ত কোষ কালচার মিডিয়ামে রেখে এর বংশবৃদ্ধি করানো হয়। এ সময় কাঙ্খিত জিনবাহী প্লাজমিডও পোষক কোষে বংশবৃদ্ধি করে। এভাবে, পোষক দেহে রিকম্বিনেন্ট DNA-র অবিকল কপি সৃষ্টি করাকে **জিন ক্লোনিং** (gene cloning) বলে। কোষাভ্যন্তরে কাঙ্খিত জিন থেকে যে সব উপাদান সংশ্লেষিত হওয়ার কথা তা উৎপন্ন হলে বুঝতে হবে যে জিনের ক্লোনিং সঠিক ও সফল হয়েছে। সফল ক্লোনিং জিনের ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে কাঙ্খিত উপাদান প্রাপ্তি ব্যাপকতর করা হয়। এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রাপ্ত উপাদান সংগৃহীত হতে থাকে।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme) : যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স-এর একটি অংশ কেটে নেয়া যায় ঐ এনজাইমকে **রেস্ট্রিকশন এনজাইম** বলে। এদেরকে **রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ** (endonucleases)-ও বলা হয়। এরা DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স, যাকে **রেস্ট্রিকশন সাইট** (restriction site বা recognition site) বলা হয়, তা কেটে দিতে সক্ষম। এ ধরনের এনজাইম প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাকটেরিয়া কোষে বিদ্যমান থাকে। এদের কাজ হলো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাল DNA কেটে দেয়া। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ কমপক্ষে একটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন করে থাকে। শত শত প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষে শত শত ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন হয়। এরা DNA সূত্র কাটার জন্য নিজস্ব সিকোয়েন্স শনাক্ত করতে পারে এবং রেস্ট্রিকশন সাইট কেটে দিতে পারে।

CamScanner

কয়েকটি অতি পরিচিত রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও এদের রেস্ট্রিকশন স্থান নিচে দেখানো হলো :

এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান	এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান
Bam HI	G | GATCC CCTAG | G	Hpa II	C | CGG GGC | C
Hind III	A | AGCTT TTCGA | A	Mbo I	| GATC CTAG |
Eco RI	G | AATTC CTTAA | G		

দিয়ে DNA অণুর কাটার স্থান দেখানো হয়েছে।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কাঙ্ক্ষিত DNA অংশকে কাটলে দুরকম প্রান্তদেশ তৈরি হতে পারে। এক ধরনের প্রান্তদেশকে বলে **ব্লান্ট প্রান্ত** (blunt end) ও অপর ধরনের প্রান্তদেশকে বলে **স্টিকি প্রান্ত** (stiky end)। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রায় ২৫০ রকম রেস্ট্রিকশন এনজাইম পাওয়া গেছে। কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম, উৎস ও প্রান্তদেশের প্রকৃতি উল্লেখ করা হলো, যেমন : *Bam* HI (*Bacillus amyloliquefaciens* H)- স্টিকি (Sticky); *Hind* III (*Haemophilus influenzae* Rd)- স্টিকি; *Eco* RI (*Escherichia coli* RY-13)- স্টিকি; *Hpa* I (*Haemophilus parainfluenzae*)-স্টিকি; Sma I (*Serratia marcescens*)-ব্লান্ট (blunt) প্রভৃতি।

রিকম্বিনেন্ট DNA কাঙ্ক্ষিত জিন বহন করছে কিনা তা শনাক্তকরণ : এটি করা হয় (i) PCR পদ্ধতিতে, (ii) Restriction digestion-এর মাধ্যমে এবং (iii) জেনেটিক প্রোব-এর মাধ্যমে। জেনেটিক প্রোব (genetic probe) device মেটাল ডিটেক্টর-এর তুলনীয় একটি উপায়। জেনেটিক প্রোব হলো রেডিও অ্যাকটিভলি চিহ্নিত টার্গেট জিনের (কাঙ্ক্ষিত জিনের) পরিপূরক এক স্ট্র্যান্ডবিশিষ্ট DNA বা mRNA।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষক কোষে প্রবেশ করানো হয়।

ক. প্রত্যক্ষ ভৌত (Phyical) প্রক্রিয়া

(i) **Electroporation :** তৈরি ইলেকট্রিক ক্ষেত্র কোষঝিল্লিতে সংকীর্ণ ছিদ্র তৈরি করে এবং রিকম্বিনেন্ট DNA কোষে প্রবেশ করে।

(ii) **Micro injection :** একটি মাইক্রোপিপেট দিয়ে কোষকে ধরে রাখা হয় এবং অন্য একটি অতিসূক্ষ্ম সুঁই দিয়ে DNA কে কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(iii) **Biolistics (Gunshot) :** কোনো ধাতব পিন্ডের (স্বর্ণের) উপরিতলে DNA বসিয়ে সেই পিণ্ডকে Gunshot করে উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করানো হয়।

খ. প্রত্যক্ষ রাসায়নিক (Chemical) প্রক্রিয়া

(i) **Calcium Chloride :** কোষকে ঠাণ্ডা $CaCl_2$ দ্রবণে ইনকিউবেট করে পরে 'হিটশক' দিলে DNA কোষে প্রবেশ করে।

(ii) **Liposomes :** কৃত্রিম ভেসিকলের (vesicle) সাথে DNA সম্পৃক্ত হয়, পরে কোষঝিল্লির সাথে ভেসিকল সংযুক্ত হয়ে যায় এবং DNA কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

গ. ভেক্টর ব্যবহারের পরোক্ষ প্রক্রিয়া

(ii) *Agrobacterium tumefaciens* নামক ব্যাকটেরিয়াকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করে এটা করা হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড কাঙ্ক্ষিত জিনসহ সহজেই উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করতে পারে।

(iii) TMV : TMV কাঙ্ক্ষিত জিনসহ এর RNA কে উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করাতে সক্ষম। তামাক গাছে সহজে প্রবেশ করে থাকে। ব্যাকটেরিয়াতে বাইরের DNA প্রবেশ করানোকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন এবং প্লাজমিডকে প্রকৃত কোষে প্রবেশ করানোকে বলা হয় ট্রান্সফেকশন।

টিস্যু কালচার ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	টিস্যু কালচার	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
১. সংজ্ঞা	জীবদেহের বিচ্ছিন্নকৃত কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যু কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করে চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি বা টিস্যু বৃদ্ধির (প্রাণীর ক্ষেত্রে) প্রক্রিয়াকে **টিস্যু কালচার** বলে।	কোনো জীবের DNA-তে ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত এক বা একাধিক কাঙ্ক্ষিত জিন বা DNA খন্ড সংযুক্ত করে সংকর DNA তৈরির কৌশলকে **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি** বলে।
২. অপত্য উদ্ভিদের ধরন	উৎপন্ন জীব (উদ্ভিদ) প্যারেন্ট (মাতৃউদ্ভিদ) জীবের সমগুণ সম্পন্ন হয়।	উৎপন্ন জীব প্যারেন্ট জীব থেকে ভিন্নগুণ সম্পন্ন হয়।
৩. জিন ম্যানিপুলেশন	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপের পরিবর্তন করা হয় না।	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপের পরিবর্তন করা হয়।
৪. ব্যবহার	ভাইরাস ও রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।	কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।
৫. চারা উৎপাদন	এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক উদ্ভিদের চারা উৎপাদন সম্ভব।	এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব নয়।
৬. প্রক্রিয়া	অপেক্ষাকৃত কম জটিল প্রক্রিয়া।	অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল প্রক্রিয়া।
৭. বাহক বা ভেক্টর (প্লাজমিড)	এক্ষেত্রে বাহক বা ভেক্টরের প্রয়োজন হয় না, কারণ জিন বিনিময় বা স্থানান্তরের সুযোগ নেই।	এক্ষেত্রে বাহক বা ভেক্টরের প্রয়োজন হয়, কারণ জিন বিনিময় বা স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে।
৮. স্বাস্থ্য ঝুঁকি	স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।	স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা বর্তমান।

জিন ক্লোনিং (Gene cloning)

ক্লোন (clone) শব্দের অর্থ **'হুবহু প্রতিরূপ'**। যে পদ্ধতিতে জিনগতভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহুজীব বা বহুকোষ সৃষ্টি করা হয় তাকে **ক্লোনিং** বলে। অন্যভাবে বলা যায়, **একটি কাঙ্ক্ষিত জিনের (DNA) অসংখ্য হুবহু কপি বা সংখ্যাবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে জিন ক্লোনিং বলে**। এক কথায়, ক্লোনিং হলো হুবহু প্রতিরূপ বা অবিকল নকল তৈরি করা। এটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। একই জিনোটাইপ বিশিষ্ট একাধিক জীব বা জীবাংশকে ক্লোন বলা হয়। ক্লোন মাতৃউদ্ভিদের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে।

CamScanner

জিন ক্লোনিং কৌশলের নীতি

অধুনা জিন বা DNA-এর ক্লোনিং খুবই জনপ্রিয় একটি কৌশল। আণবিক পর্যায়ে ক্লোনিং কৌশলের ধাপগুলো নিম্নরূপ–

i. প্রথমে কোনো জীবের DNA -এর একটি অংশকে একটি বাহক অণুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ii. এর ফলে সৃষ্ট রিকম্বিনেন্ট DNA অণু পোষক কোষে (যেমন–ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, উদ্ভিদ বা প্রাণী) স্বাভাবিকভাবে প্রতিলিপি গঠন করতে পারে, অর্থাৎ উল্লেখিত জীবের DNA এর অনেকগুলো হুবহু কপি সৃষ্টি হয় এবং এদের **ক্লোন** বলে।

একটি ক্রোমোজোমের DNA-তে অসংখ্য জিন থাকতে পারে। এর সবগুলোই কাঙ্ক্ষিত জিন নয়। কেননা, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রথমে কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন খোঁজা হয় এবং ঐ প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত বিজ্ঞানিগণ জীবের DNA এর ক্যাটালগের জিন লাইব্রেরি তৈরি করেন এবং ঐ জিন লাইব্রেরি থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করেন।

গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা উন্নতমানের প্রোটিন তৈরির জন্য রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির একটি উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ জিনের বহু কপি তৈরি করা। একটি জিনের বহু সংখ্যক হুবহু কপি তৈরি করাই হলো জিন ক্লোনিং।

জিন ক্লোনিং এর জন্য জিনের উৎস

জিন ক্লোনিং এর জন্য তিনটি উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন পাওয়া যায়। যথা–

১. জিন লাইব্রেরি (DNA সংগ্রহশালা)।

২. কমপ্লিমেন্টারি DNA (cDNA)।

৩. গবেষণাগারে অর্গানিক কেমিস্টগণ কর্তৃক তৈরিকৃত DNA খণ্ড।

ক্লোনিং-এর প্রকারভেদ

এটি প্রধানত ২ প্রকার, যথা–**১. জিন ক্লোনিং** বা **DNA ক্লোনিং** ও **২. রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং**।

১. জিন ক্লোনিং (Gene cloning) : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে জিন ক্লোনিং বা DNA ক্লোনিং করা হয়। কাঙ্ক্ষিত জিনের অনেকগুলো প্রতিলিপি সৃষ্টি করে জিনের চাহিদা পূরণে জিন ক্লোনিং-এর যেসব কৌশল ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়েছে এদেরকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– **(ক) কোষভিত্তিক DNA ক্লোনিং** ও **(খ) কোষবহির্ভূত DNA ক্লোনিং**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. কোষভিত্তিক DNA ক্লোনিং (Cell mediated DNA cloning) : এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে কোনো পোষক কোষ কাঙ্ক্ষিত জিনের প্রতিলিপি গঠন করে। কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড কেটে ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সফেকশন, কনজুগেশন, ইলেকট্রোপোরেশন, মাইক্রোইনজেকশন, জিন গান ইত্যাদির যে কোন একটি প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের প্লাজমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে প্লাজমিড DNA টি একটি **রিকম্বিনেন্ট** DNA -তে পরিণত হয়। উপযুক্ত মাধ্যমে এই রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ব্যাকটেরিয়াম আবাদ করলে অল্প সময়ে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি ব্যাকটেরিয়ামে ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন থাকবে। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত জিনের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করা হয়। জিন ক্লোনিং-এর জন্য উপযুক্ত পোষক কোষগুলো হলো– *E.coli*, ঈস্ট, উদ্ভিদ, স্তন্যপায়ী প্রাণী কিংবা তার কোনো কোষ প্রভৃতি। ক্লোনিং-এর জন্য ব্যবহৃত ভেক্টর বা বাহকের মধ্যে *E.coli* এর প্লাজমিড, ব্যাকটেরিওফায, ব্যাকটেরিয়ার জন্য BAC (Bacterial Artificial Chromosome), ঈস্টের জন্য YAC (Yeast Artificial Chromosome) অন্যতম।

খ. কোষবহির্ভূত জিন ক্লোনিং (In vitro gene cloning) বা PCR (Polymerase Chain Reaction): এটি জিন ক্লোনিং বা DNA ক্লোনিং এর একটি সহজ যান্ত্রিক উপায়। PCR দ্বারা দেহের বাইরে বিক্রিয়া মিশ্রণে কাঙ্ক্ষিত জিনের অনেক প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **Kary Mullis** কোষ বহির্ভূত DNA ক্লোনিং এর দ্রুততম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে **পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন** (PCR) বলে। PCR এর মাধ্যমে টেস্টটিউবে একটি জিনের বহু কপি করা যায়। প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA -কে Tag পলিমারেজ সহযোগে ৯০° সে. তাপমাত্রায় তাপ দিলে DNA এর সূত্রদুটি খুলে ২টি পৃথক একক সূত্রে পরিণত হয়। এরপর ৫০°– ৫৫° সে. নামিয়ে আনলে DNA রেপ্লিকেশনের জন্য – ৫′ প্রান্তে একটি **প্রাইমার** যুক্ত হয়। একটি প্রাইমার ১২ থেকে ২০ বেইস পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ৭০° – ৭২° সে, তাপমাত্রায় Tag **পলিমারেজ** তখন দ্রুততম গতিতে সম্পূরক সূত্র তৈরী করে। এ প্রক্রিয়া খুব দ্রুততম এবং সহজ প্রক্রিয়া। প্রতি মিনিটে সূত্র তৈরীর হার ১০০০। কম্পিউটার চালিত যে যন্ত্রের মধ্যে DNA সংশ্লেষণ পরিচালিত হয় তাকে **থার্মাল সাইক্লার** (thermal cycler) বলে। এ চেইনের প্রতিটি ধাপে বিক্রিয়া ঘটতে সময় লাগে ২–৫ মিনিট। তিন ঘন্টার কম সময়ে ২৫–৩০টি বিক্রিয়া করে চক্র সম্পন্ন হয়। বর্তমানে মিউটেশন পদ্ধতি দ্বারা এ হার ১০০০ bp প্রতি সেকেন্ডে।

[**PCR এর ব্যবহার :** রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু বা প্যাথোজেন নিরূপণ; নির্দিষ্ট মিউটেশন নিরূপণ; DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং; জন্মের পূর্বে ভ্রূণে বংশগত রোগ নিরূপণ; বিভিন্ন গবেষণা; আণবিক আর্কিওলজি বা প্যালিওন্টোলজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে।]

২. রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং (Reproductive cloning) : জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং বলে। ১৯৯৬ সালে জন্ম নেয়া **'ডলি'** নামক ভেড়া (ভেড়ি) রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং-এর মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দাতা ভেড়ার স্তনগ্রন্থির একটি কোষের নিউক্লিয়াসকে গ্রহীতা ভেড়ার ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস সরিয়ে তদস্থলে স্থাপন করা হয়। এ ডিম্বাণুটি বিভাজিত হয়ে ভ্রূণে পরিণত হয়। এ ভ্রূণ তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে দাতা ভেড়ার চেহারা সম্পন্ন বাচ্চার জন্ম দেয়, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডলি'। এ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় ভেড়াটি **সারোগেট মাদার** (surrogate mother) বা **পালিকা মাতার** ভূমিকা পালন করে।

rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি ও PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি	PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন)
১. ক্লোনিং	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের ক্লোনিং এবং প্রকাশ ঘটানো হয়।	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের শুধুমাত্র ক্লোনিং ঘটানো হয়।
২. সংঘটিত পদ্ধতি	এটি *In-vivo* পদ্ধতি (সজীব কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত)।	এটি *In-vitro* পদ্ধতি (সজীব কোষের বাইরে সংঘটিত)।
৩. ভেক্টরের ভূমিকা	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক।	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক নয়।
৪. উৎসেচক বা এনজাইম	rDNA টেকনোলজির প্রধান উৎসেচক রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এবং DNA এনজাইম।	PCR এর প্রধান উৎসচেক তাপ সহিষ্ণু DNA পলিমারেজ।
৫. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্র	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে rDNA টেকনোলজির ভূমিকা সবচেয়ে অধিক।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে PCR এর ভূমিকা সবচেয়ে কম।

CamScanner

জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা (Importance and Prospects of Biotechnology)

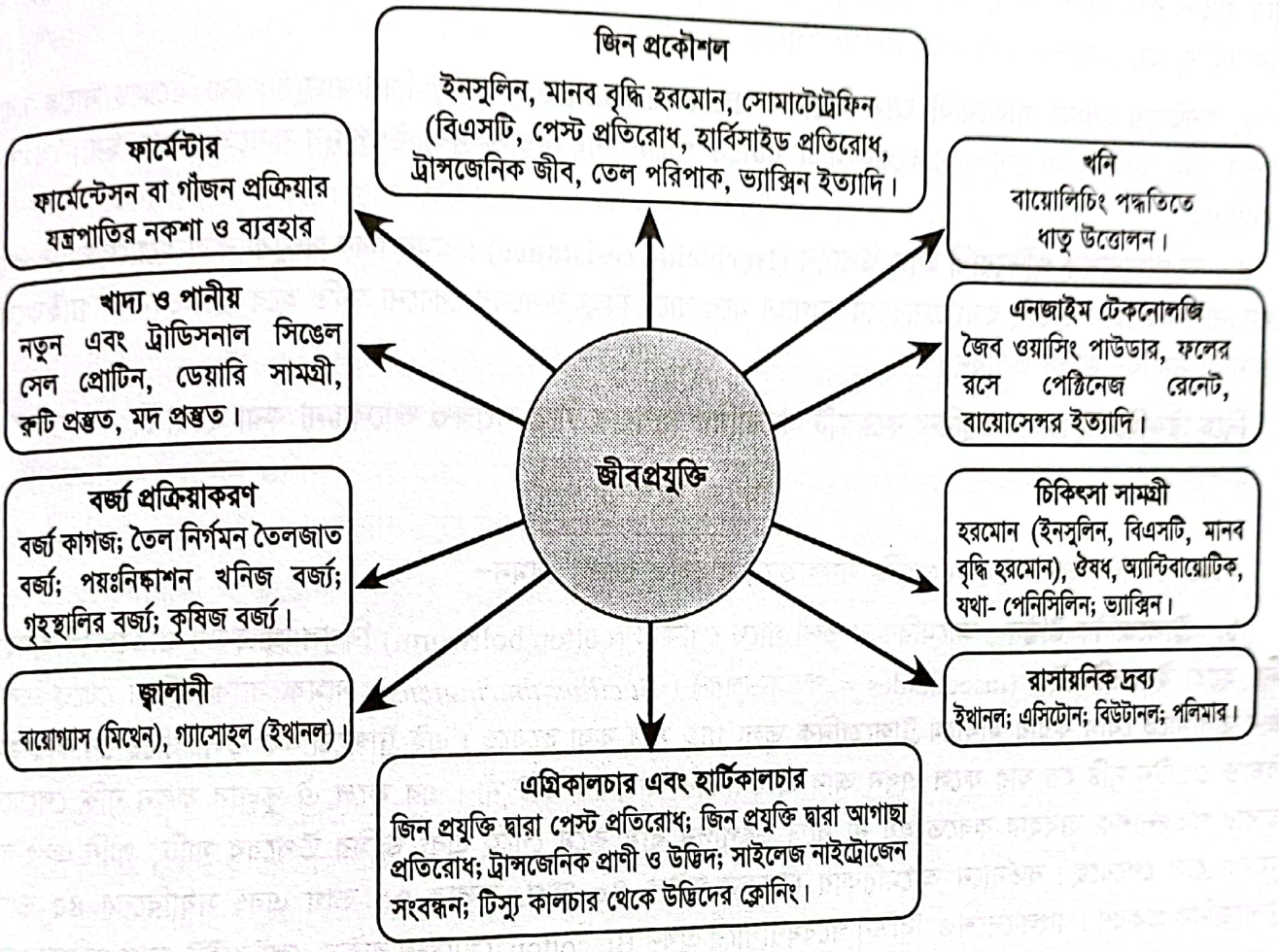

জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ
(Uses of Biotechnology/Application of Recombinant DNA Technology)

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাতে করে মানুষ সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। এ লক্ষকে সামনে রেখে বিজ্ঞানীরা **কৃষিবিদ্যা** ও **প্রাণী ব্রিডিং** কৌশলের নানারকম নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান। জীবন-জীবিকার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। এর সঙ্গে মানুষের খাদ্য ও অন্য সামগ্রী উৎপাদনে কাজে লাগে এমন উদ্ভিদ ও প্রাণিদের রোগ প্রতিরোধী করে তোলা প্রয়োজন। শস্যক্ষেত্রে উদ্ভিদকে পেস্ট প্রতিরোধী করা, জীবনদায়ী হরমোন (যেমন- ইনসুলিন) ও ওষুধ উৎপাদন, জিনগত পরিবর্তন করা, শস্য উৎপাদন (Genetically Modified crops or GM crops), জিন থেরাপির মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি কাজগুলো বিজ্ঞানীরা জীবপ্রযুক্তি (biotechnology) প্রয়োগ করে অনেক সুলভে বা কম খরচে স্বল্প সময়ে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে **জেনেটিক মডিফিকেশন** ঘটানো হয়ে থাকে।

ক্রপ জেনেটিক মডিফিকেশনের উদ্দেশ্য

১. **উপকারি দ্রব্য উৎপাদন (Novel products) :** ফসলী উদ্ভিদে এমন জিন সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে ঐ উদ্ভিদ উপকারি নতুন কোনো দ্রব্য (যা ঐ উদ্ভিদ আগে উৎপাদন করতে পারতো না) উৎপাদন করতে পারে। যেমন- তামাক গাছে হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন উৎপাদন।

CamScanner

২. **পরিবেশীয় প্রতিকূলতা উত্তরণ (Overcoming environmental resistance) :** এমন জিন সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে করে লবণাক্ততা, ঠাণ্ডা (frost), খরা বা ফসলের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধকারী অন্য যেকোনো নিয়ামকের বিরুদ্ধে অধিক সহিষ্ণু হয়। যেমন–লবণাক্ততা সহিষ্ণু 'পীনাট' উদ্ভাবন।

৩. **ক্ষতিকর পোকা প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Pest resistance) :** এমন জিন সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে করে ফসলের জন্য ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়ের মৃত্যু ঘটাতে পারে এবং বিষাক্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। যেমন– Bt.cotton.

৪. **আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Herbicide resistance) :** এমন জিন সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে করে আগাছানাশক প্রয়োগ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগাছা মরে যাবে কিন্তু ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন– গ্লাইফসেট প্রতিরোধী সয়াবিন উদ্ভিদ উদ্ভাবন।

নিচে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

ক. কৃষিক্ষেত্রে :

কৃষিক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন–

১. **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ :** আমেরিকান তুলা গাছে পোকার (cotton bollworm) বিপুল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হতো **ইনসেক্টিসাইড** (insecticides = পতঙ্গনাশক)। *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন তুলাগাছে যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ট্রান্সজেনিক তুলা গাছে পোকার জন্য বিষাক্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয় যার ফলে এখন আর ঐ পোকার আক্রমণ ঘটে না। এর ফলে ঐ তুলার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার পতঙ্গনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমে গেছে এবং জমির উপরের মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় চাষকৃত ভূট্টার ৪০ ভাগ, তুলার ৫০ ভাগ এবং সয়াবিনের ৪৫ ভাগই ট্রান্সজেনিক প্রকরণ। বাংলাদেশেও বিভিন্ন গবেষণাগারে এখন Bt. cotton, গোল্ডেন রাইস, লেটব্লাইট রোগ প্রতিরোধক্ষম আলু চাষের ট্রায়াল চলছে। অচিরেই কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হবে।

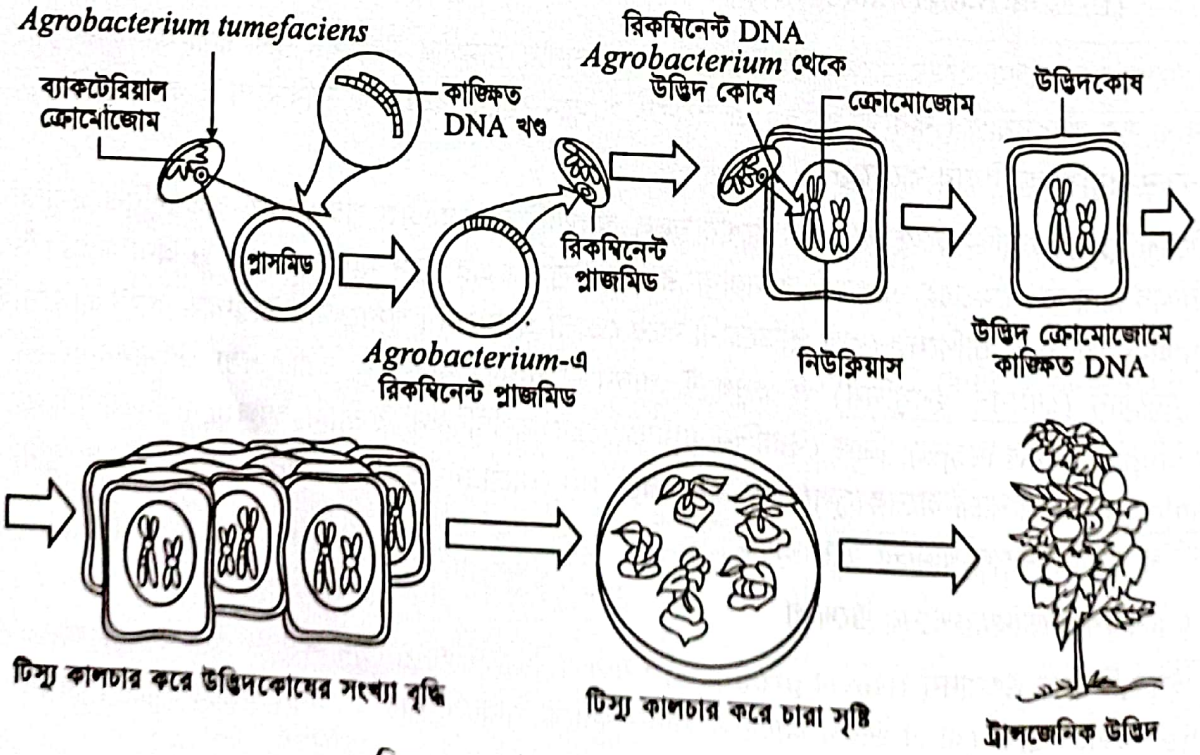

চিত্র ১১.৮ : ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি পদ্ধতি

CamScanner

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, পেঁপে, ভুট্টা, রাই, সূর্যমুখী, তুলা, নাশপাতি, গম, আঙ্গুর, তরমুজ, গাজর, ধনিয়া ইত্যাদি।

আগাছা নিধনকারী পদার্থ সহনশীল উদ্ভিদ

গ্লাইফসেট (glyphosate) একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮টি আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি আগাছার সাথে ফসল উদ্ভিদও নষ্ট করে ফেলে। কাজেই ফসল লাগানোর আগেই জমিতে আগাছনাশক দেয়া ভালো। যদি ফসল লাগানোর পরও জমিতে পুনরায় আগাছা জন্ম নেয়, তখন অতি সাবধানে এটি ব্যবহার করতে হয়।

কতক ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইম তৈরি করে থাকে যা গ্লাইফসেট ভেঙ্গে দিতে পারে। বিজ্ঞানিগণ ব্যাকটেরিয়া থেকে এ জিন পৃথক করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তুলা ও সয়াবিন উদ্ভিদে অন্তর্ভুক্ত করে **ট্রান্সজেনিক তুলা** ও **ট্রান্সজেনিক সয়াবিন** উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ফসলের জমিতে এখন নিশ্চিন্তে **গ্লাইফসেট হার্বিসাইড** (glyphosate herbicide) প্রয়োগ করা চলে।

২. আগাছা প্রতিরোধী শস্য : Streptomyces গোত্রীয় ব্যাকটেরিয়ায় এক রকম জিন আছে যা Basta নামক আগাছানাশককে প্রতিরোধ করতে পারে। স্ট্রেপটোমাইসিসের এ জিন টমেটো, আলু, ভুট্টা ও গমের মধ্যে ঢুকিয়ে Basta প্রতিরোধী শস্য তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এসব শস্যক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে আগাছানাশক ছড়িয়ে সেগুলোকে নষ্ট করা যায়; কিন্তু শস্যের ক্ষতি হয় না।

৩. গুণগত মান উন্নয়নে : অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন একটি উত্তম ব্যবসা। ভেড়া থেকে পাওয়া যায় পশম এবং মাংস। এরা **ক্লোভার** জাতীয় ঘাস খায়। ঐ ঘাসের প্রোটিনে সালফারের অভাব আছে। এর ফলে যে ভেড়া ক্লোভার ঘাস খায় এদের লোম নিম্নমানের হয়। লোমকে উন্নতমানের করতে হলে এদেরকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো এসিড সৃষ্টিকারী জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্লোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিনসমৃদ্ধ ক্লোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

৪. সুপার রাইস (Super rice) বা গোল্ডেন রাইস (Golden rice) : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিটামিন-A এর অভাব রয়েছে। এর ফলে কেবল বাংলাদেশেই প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ভিটামিন-A সমৃদ্ধ খাবারের অভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। এশিয়ার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাতের মাধ্যমে ভিটামিন-A এর অভাব পূরণ করতে পারলেই আমাদের সন্তানেরা আর রাতকানা বা অন্ধ হবে না। সুইস বিজ্ঞানী **Ingo Potrykus** ও জার্মান বিজ্ঞানী **Peter Beyer** (১৯৯৯) রিকম্বিনেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে *Japonica* টাইপ ধানে, ড্যাফোডিল থেকে **বিটা ক্যারোটিন** তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এ ধানের ভাত খেলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাতপ্রিয় জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মায়ের দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। ২০০৮ সালে 'গোল্ডেন রাইস-২' নামে আরো একটি নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি পূর্ববর্তী জাত থেকে ২৩ গুণ বেশী β ক্যারোটিন সমৃদ্ধ।

৫. দীর্ঘজীবী টমেটো সৃষ্টি : বন্যজাতের টমেটো (*Lycopersicon esculentum*) থেকে পলিগ্যালাক্টোইউরোনেজ (Polygalacturonase Gene-PG) জিন সংগ্রহ করে আধুনিক জাতের টমেটোতে **অ্যান্টিসেন্স প্রযুক্তির** সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে আমেরিকায় **ক্লোভার সেভর** (Flavr Savr) নামক টমেটো (CGN-89564-2) উদ্ভাবন করা হয়েছে। PG জিন থাকায় এ টমেটো দেরিতে পাকে, সহজে পচে না এবং দীর্ঘদিন সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া তৈরি হয়েছে ব্রিটিশ **জেনেকা**

৬. অধিক ফলনশীল শস্য উদ্ভিদ সৃষ্টি : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে অধিক সালোকসংশ্লেষণ, নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন, অধিক পুষ্ট ফল সৃষ্টি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদজাত উৎপাদন করা যায়। এভাবে ধান, গম, ভুট্টা, চীনাবাদাম, ডাল ও তৈলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৭. নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে **'নিফ জিন'** (যা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী) *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন'বাহী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে। ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।

৮. রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস-এর **কোট প্রোটিন** (CP) জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ হতে নিজেকে প্রতিরোধ করছে। ইতোমধ্যে একইভাবে পেঁপের রিংস্পট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৯. দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টিতে : জোনাকি পোকার দেহে **লুসিফারেজ** নামক এনজাইমের প্রভাবে **'লুসিফেরিন'** নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই জোনাকি পোকা উড়ার সময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ লুসিফেরিন পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন তামাক গাছে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে তামাক গাছের পাতা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাই রাতের বেলা অন্ধকার স্থানে এরা বেশ শোভাবর্ধন করে ও বিদ্যুৎ স্বাশ্রয় করে।

১০. রোগ প্রতিরোধক্ষম ট্রান্সজেনিক শাকসব্জি উদ্ভাবন : মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগ যেমন– হেপাটাইটিস-বি, প্রোটিন (antigen) সমৃদ্ধ তামাকগাছ, কলেরা প্রতিরোধী আলু, জলাতঙ্ক প্রতিরোধী অ্যান্টিজেন সমৃদ্ধ টমেটো এবং অন্ত্র, কোলন, বৃহদন্ত্র, ডিম্বাশয় ও ফুসফুসের ক্যান্সাররোধী প্রোটিন সমৃদ্ধ সয়াবিন গাছ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে জীবপ্রযুক্তি। এতে সুবিধা হলো– খুব সহজে এসব ট্রান্সজেনিক শাকসবজি, ফলমূল মানুষ গ্রহণ করতে পারে এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীনভাবে শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয়।

১১. নতুন প্রকরণ সৃষ্টিতে : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীতে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন–রাই জাতীয় সরিষা থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জিন নিয়ে গমের কয়েকটি প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২. অতি লবণাক্ত সহনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে **DPS Varma** সয়াবিন গাছ থেকে Pyroline-5-Carboxylase Synise জিনটি পৃথক করে তামাকগাছে সন্নিবেশিত করার পর দেখা গেল ঐ তামাকগাছ আগের চেয়ে 20 গুণ অধিক লবণাক্ত জমিতে ভালোভাবে জন্মাতে পারে।

১৩. বীজহীন ফল সৃষ্টিতে : অনেক দেশে বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বীজহীন ফল তৈরি করা হচ্ছে। যেমন–জাপানে বীজহীন আঙুর, তরমুজ, কলা, লেবু উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই আধুনিক প্রতিফলন।

১৪. *Bacillus subtilis* থেকে csp B জিন ভুট্টা উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে ভুট্টাকে খরা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে।

১৫. *Arabidopsis* থেকে At NHXI জিন প্রবেশ করিয়ে 'পীনাট' উদ্ভিদকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু করা সম্ভব হয়েছে।

১৬. ভাইরাস প্রতিরোধী শস্য : টমেটো, আলু ও তামাকগাছের ক্ষতিকর ভাইরাসের খোলকে প্রোটিন ঢুকিয়ে অনাক্রমতা জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এরকম উদ্ভিদগুলো ভাইরাস প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

১৭. ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত উদ্ভাবন : স্পেনের Lleida বিশ্ববিদ্যালয়ের **ড. পল ক্রিস্টো** (Dr. Paul Christo) ও তার সহকর্মীরা ২০০৯ সালে বিটা ক্যারোটিন, ফলিক এসিড ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ জিনগত রূপান্তরের মাধ্যমে $M_{37}W$ নামের ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেন। এই উদ্ভাবিত জাত উন্নয়নশীল দেশের কোটি কোটি মানুষের ভিটামিনের অভাব দূর করবে।

CamScanner

১৮. ক্ষতিকারক পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি

i. *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়ার **Toxin জিনকে** ভুট্টা, ধান ও আলুগাছে ঢুকিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক শস্য তৈরি করা হয়েছে, যারা কীটনাশক প্রয়োগ ছাড়াও পতঙ্গ নাশ করাতে পারে। উল্লেখ্য যে, *B.thuringiensis*-এর বিষাক্ত প্রোটিন তৈরিকারী জিন ভুট্টাগাছে স্থাপন করে **ইউরোপিয়ান কর্নবোরার** নামক মথ প্রতিরোধী ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ii. *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে এক রকম বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারী জিন রাইজোবিয়ামের মধ্যে ঢোকানো গেছে। রাইজোবিয়াম শিমগোত্রীয় গাছের মূলে অর্বুদ সৃষ্টি করে। যে রকম গাছে এরকম বিশেষ জিন সমৃদ্ধ রাইজোবিয়াম প্রয়োগ করা হয় তারা **উইভিল** জাতীয় ক্ষতিকারক পতঙ্গের আক্রমণ রোধ করতে পারে।

iii. তুলাগাছের দেহে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (*Bacillus thuringiensis*) উৎপাদিত **'Bt toxin gene'** থাকে। এই টক্সিন পদার্থ (Bt টক্সিন) তুলাগাছের পেস্ট প্রাণীরা (যেমন–লেপিডোপটেরা পতঙ্গ, বিটল, মাছি, মশা ইত্যাদি) ভক্ষণ করলে সেগুলো মারা যায়, ফলে তুলাগাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর কয়েকটি জাত। যেমন– Bt Uttara, Bt Kajla, Bt Nayantara and Bt ISD 006।

iv. Cowpea এর **Cp Ti gene** ব্যবহার করেও পতঙ্গরোধী ট্রান্সজেনিক গাছ তৈরি করা হয়েছে।

v. *Bacillus thuringiensis* একটি বড় আকৃতির সয়েল ব্যাকটেরিয়া (মৃত্তিকাবাসী), যা বায়োইনসেক্টিসাইড হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

iii. **স্টেরাইল ইনসেনক্ট টেকনিক** (Sterial Insect Technique-SIT) : এটি একটি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি, যদিও এটি রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নয়। এটি ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক পতঙ্গের পুরুষগুলোকে বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়। এর ফলে স্ত্রী পতঙ্গসমূহ কার্যকর ডিম উৎপাদনের অক্ষম হয়, ফলে নতুন প্রজন্ম বিকশিত হতে পারে না। এ পদ্ধতির প্রস্তাবক হলেন **Edward Kripling & Raymond Bushland** (1937)। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন Insects Biotechnology গবেষণাগারে SIT নিয়ে গবেষণা চলছে।

নিচে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ দেখানো হলো–

বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ (Traits)	ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ (GM শস্য)
১. ভাইরাস প্রতিরোধ (Virus resistance)	কার্পাস (cotton), আলু, টমেটো, তরমুজ, শশা।
২. পতঙ্গ প্রতিরোধ (Insect resistance)	কার্পাস, ভুট্টা, রেপসিড, তামাক, আলু।
৩. আগাছানাশক প্রতিরোধ (Herbicide resistance)	কার্পাস, ভুট্টা, রেপসিড, টমেটো, আলু, তামাক।
৪. বীজে রূপান্তরিত প্রোটিন সঞ্চয় (Modified seed storage protein)	ধান, সয়াবিন, সূর্যমুখী।
৫. অধিকতর পুষ্টিকর গুণ (Better nutritions value)	ধান, গম, ভুট্টা।
৬. রূপান্তরিত পরিপক্বতা (Modified ripening)	টমেটো।
৭. অ্যাগ্লুটিনিন (Agglutinin)	ভুট্টা।
৮. নিমাটোড প্রতিরোধ (Nematode resistance)	তামাক।

CamScanner

১৯. ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী সৃষ্টি : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সাহায্যে ট্রান্সজিন সন্নিবেশিত করণের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীকে **ট্রান্সজেনিক প্রাণী** (transgenic animal) বা **GM প্রাণী** বলে। প্রাণীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিন ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে প্রধানত গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে উৎপাদিত পদার্থের বা বস্তুর পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারণে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উৎপাদন করা হয়, যেমন– (i) গৃহপালিত পশুপাখিতে আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে অনুপ্রবেশ করানো; (ii) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ তৈরি করা; (iii) অধিক পরিমাণে দুধ, মাংস, মাছ এবং উন্নত মানের পশম উৎপাদন; (iv) ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দুধ, মূত্র ও রক্ত থেকে মূল্যবান প্রোটিন সংগ্রহ করা; (v) জিনের বহিঃপ্রকাশ বা অন্য কোনো মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা ইত্যাদি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সফলভাবে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করা হয়।

ট্রান্সজেনিক প্রাণীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম সফলতা হলো মানুষের **antithrombin III** উৎপাদন যা ট্রান্সজেনিক ছাগলের দুধ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মানুষের বংশগত রোগ **অ্যান্টিথ্রম্বিন ডিফিসিয়েন্সী** (antithrombin deficiency) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দ্বিতীয় সফলতা হলো মানুষের **C12 esterase inhibitor** উৎপাদন যা ট্রান্সজেনিক খরগোশের দুধ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মানুষের বংশগত রোগ **অ্যানজিওডেমা** (angiodema) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

২০. অন্যান্য : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুতে ২০-৪০% স্টার্চ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং টমেটোতে স্টার্চের পরিমাণ কমিয়ে সুক্রোজের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক উদ্ভিদকে উষ্ণতা, শৈত্য, ভারী ধাতু, নাইট্রোজেন, লবণাক্ততা প্রভৃতি মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোন প্রাণী
১. প্রবেশের প্রক্রিয়া	ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা জাইগোটে বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানো হয়।	ক্লোন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে উক্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর ভেতর (যে প্রাণীকে ক্লোন করা হবে তার) অন্য প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়।
২. জিনগত পার্থক্য	বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানোতে জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	দুটি প্রাণীর নিউক্লিয়ার জিন একত্রিত হয় না বিধায় জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
৩. বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ	বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে।	কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।
৪. জিনোমগত পার্থক্য	জিনোমগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	জিনোমগত গঠন হুবহু এক।
৫. মিউটেশন বা প্রকরণ	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে।	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে না।
৬. বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখা দেয়।	বাহ্যিক প্রকাশ হুবহু রকম।
৭. ব্যবহার	শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা এককোষী জাইগোট ব্যবহৃত হয়।	কেবল ডিম্বাণুর খোলশ ব্যবহৃত হয়।

GMO কী ?

যে প্রক্রিয়ায় এক প্রজাতির DNA থেকে জিন সংগ্রহ করে সম্পর্কহীন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর জিনে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ ঘটিয়ে জিনগত পরিবর্তিত জীবের সৃষ্টি করা হয় তাকে GMO বলে।

GMO সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization = WHO)-র **সংজ্ঞানুযায়ী, যদি কোনো জীবের জেনেটিক পদার্থ (DNA) এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়, যে অবস্থায় এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে কখনোই পাওয়া যায় না সে ধরনের জীবকে**

CamScanner

জিনগত পরিবর্তিত জীব (Genetically Modified Organism = GMO) **বলে**। GMO সৃষ্টির সময় ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, কীটপতঙ্গ, প্রাণী, এমনকি মানুষ থেকেও বহিরাগত জিন আহরিত হতে পারে। জিনতত্ত্বে যেসব নির্বাচনি বংশবৃদ্ধি (selective breeding), টিস্যু কালচার, হাইব্রিডাইজেশন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয় তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়। GMO থেকে এগুলোর পার্থক্য হচ্ছে : প্রচলিত হাইব্রিডাইজেশনে ট্রান্সজেনিক জীবের (GMO) সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়।

১৯৯৫ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম GMO খাদ্য মানুষের আহারযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ শস্য, তুলা ও সয়াবিন গাছ GM (Genetically Modified) বলে জানা যায়। ২০১২ সালের শেষ দিকে বিশ্বের ৩২টি দেশের ১১.২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার (বিশ্বের চাষযোগ্য জমির প্রায় এক-দশমাংশ) জমি GM খাদ্য চাষের আওতায় চলে আসে। বর্তমানে ৬টি দেশ (যথা-আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, ইন্ডিয়া) বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ GM খাদ্যশস্য উৎপাদন করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রথম GM (Genetically Modified) খাদ্য ফসল

GM ফসল কী ?

জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে GM ফসল বলে।

নতুন প্রজন্ম নতুনত্ব চায়। বিজ্ঞান নতুন প্রজন্মকে বিভিন্ন বিষয়ে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৩২টি দেশ GM ফসল (Genetically Modified Crop) উৎপাদন করছে। এরা ট্রান্সজেনিক, GM ও GM -শস্য নামেও পরিচিত। এসব জাত থেকে প্রাপ্ত খাদ্যকে Genetic Food বা GM-খাদ্য বা G.E.food বলে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৪, Bt-বেগুন চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি নির্বাচিত জাত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ঐ চারটি জাতের অনেক সাফল্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে GM-খাদ্য : Bt-বেগুন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম GM -খাদ্য ফসল। Bt শব্দের যুক্তি : *Bacillus thuringiensis* মৃত্তিকাবাসী ব্যাকটেরিয়ার Bt টক্সিন উৎপাদনকারী **ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন** (Cryl Ac) নামক একটি জিন ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে বেগুন কোষে প্রতিস্থাপিত করে Bt-বেগুন উৎপন্ন করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার গণ ও প্রজাতিক পদের আদ্যক্ষর থেকে Bt শব্দটি এসেছে। বিভিন্ন ভাবে প্রমাণিত যে, বেগুনের Bt-ক্রিস্টাল জিন পোকার জন্য ক্ষতিকর হলেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়।

সাধারণ বেগুন ও Bt বেগুনের ভিতর নানান রকম ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন-

সাধারণ বেগুন	Bt বেগুন
i. এই গাছের কচি ডগা ও ফল এক প্রকার পোকা ছিদ্র করে।	i. Bt বেগুনি গাছের কচি ডগা ও ফল কোন পোকা ছিদ্র করতে পারে না।
ii. গাছ বৃদ্ধি লাভ না করায় ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়।	ii. গাছের বৃদ্ধি কোন কারণে ব্যাহত না হওয়ায় ফলন খুব ভাল হয়।
iii. প্রতি সিজনে ৬০-১৮০ বার পোকানাশক স্প্রে করতে হয়।	iii. কোন পোকানাশক স্প্রে করতে হয় না।
iv. ঋতুভিত্তিক এই বেগুন পাওয়া যায়।	iv. বৎসরের সব সময় এই বেগুন পাওয়া যায়।

পেস্টিসাইড বা পোকানাশক স্প্রে করলে কী হয় ?

বেগুন গাছে পোকানাশক স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ থেকে গাছ ও ফসল সাময়িক রক্ষা পায় বটে, কিন্তু-ক্ষতিগ্রস্থ হয়-মানুষ ও প্রকৃতি।

i. বেগুনের সাথে ওষুধ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং পরিণামে ক্যান্সার-এর মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।
ii. ফসলের জমি থেকে বৃষ্টির পানির সাথে পোকানাশক বিষ নিকটস্থ নদী-নালা-বিলে জমা হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

CamScanner

iii. মাটি ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়।
iv. কৃষকের হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বহু কর্মঘন্টা ব্যয় করে ওষুধ স্প্রে করতে হয়।
v. ওষুধ স্প্রেকারী ব্যক্তিও এক সময় এই বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে কেবলমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাভবান হয়, আর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Bt বেগুন চাষ করার ভাল দিকগুলো

১. এ বেগুনে পোকা আক্রমণ করে না, ফলে বেগুন নষ্ট হয় না। ২. এ বেগুন চাষে পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয় না, তাই ঐ ওষুধের বিষক্রিয়া ও ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ৩. উৎপাদনে খরচ কম। ৪. এগুলো পরিবেশবান্ধব হওয়ায় মাটি ও পরিবেশ বিষমুক্ত থাকবে। ৫. ফসল বৃদ্ধি পায়। ৬. পাশের জলাশয় বিষমুক্ত থাকলে জলজ খাদ্য শৃংখল ভেঙ্গে পড়ে না।

GM ফসল নিয়ে পৃথিবীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের মতামত

Bt-ক্রিস্টাল জিন-একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরী করে। কারণ সচরাচর একটি জিন একটি প্রোটিন তৈরী করে। Bt ক্রিস্টাল জিন যে প্রোটিন তৈরী করে তা মানুষের জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয় এবং পোকামাকড়ের জন্য মারাত্মক। Bt বেগুন উদ্ভাবনের পর বিশ্বের খ্যাতনামা ১০টি দেশের গবেষণাগারে মাছ, মুরগি, খরগোশ, ইঁদুর, শৃগাল ইত্যাদির উপর পরীক্ষা করে কোন প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কাজেই Bt বেগুন স্বাস্থসম্মত এতে কোন দ্বিধা নেই।

GMO ও GM খাদ্যের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধাসমূহ : ১. ট্রান্সজেনিক খাদ্যশস্যে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে দেয়। ২. ফসলের অধিক ফলন হয় এবং পরিবেশীয় পীড়ন অর্থাৎ ঠাণ্ডা, খরা, তাপ, লবণাক্ততা ইত্যাদি সহ্য করতে পারে। ৩. এদের খাদ্যের গুণগতমান উন্নত। খাদ্যে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান, যেমন -সোনালী ধানের চাউলে উচ্চ মাত্রার বিটা ক্যারোটিন, কিছু সয়াবিনে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। ৪. ফসল মজুদ অবস্থায় ফসলের ক্ষতি কম হয়। ৫. মাটির উর্বরতা বজায় থাকে। ৬. আগাছা, জীবাণু ও পোকা প্রতিরোধী হয়। ৭. এগুলো পরিবেশবান্ধব হয়। ৮. খাদ্য অনেক দিন অবিকৃত থাকে, ফলে হিমাগারে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। ৯. শিল্পের বিকল্প উৎপাদন করে।

অসুবিধাসমূহ : ১. দেশীয় জাতের অন্যান্য জীবের ক্ষতি করে। ২. কীটনাশক প্রতিরোধী করে তোলে। ৩. স্বাভাবিক ইকোসিস্টেমের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ৪. ট্রান্সজেনিক খাদ্য অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে। ৫. ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন মানুষের দেহে ক্ষতি করতে পারে। ৬. মানবদেহে নতুন টক্সিন, অ্যালার্জেন, কার্সিনোজেন (ক্যান্সার সৃষ্টিকারী) ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে। ৭. জিনের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে পারে। ৮. প্রকৃতিতে আগাছানাশক প্রতিরোধী অতিআগাছা (superweed) সৃষ্টি করতে পারে। ৯. GM ফুডের অতিরিক্ত আমিষ মানবদেহে স্থূলতাসহ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ১০. ট্রান্সজেনিক জীব তৈরি করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ও ব্যয়বহুল।

খ. চিকিৎসা বিজ্ঞানে

মানুষ ও বিভিন্ন রকম গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের টিকা, হরমোন, অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন ব্যবহার করে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর রোগের প্রতিকার করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও ওষুধ শিল্পে এ প্রযুক্তির কিছু ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা দেয়া হলো।

১. ভ্যাকসিন উৎপাদন : কোনো কোনো রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে দিলে ঐ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে **ভ্যাকসিন** (vaccine) বা **টিকা** বলে। গুটিবসন্ত, জলাতঙ্ক, কলেরা, যক্ষ্মা, মামস, হাম, হেপাটাইটিস-বি, কোভিড-১৯ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

CamScanner

২. **গ্রোথ হরমোন উৎপাদন :** মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী গ্রোথ হরমোন **সোমাটোট্রপিন** উৎপাদনকারী জিনকে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে (*E.coli*) সংযুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে এ হরমোন উৎপাদন করা হচ্ছে। এ হরমোন বামনত্ব রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। প্রতি সপ্তাহে ৬–১০ মিলিগ্রাম গ্রোথ হরমোন প্রয়োগে প্রথম বছরেই মানুষ ৬ সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা হয়।

৩. **বায়োফার্মিং (Biopharming) :** যখন ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বড় মাত্রায় উৎপাদন করা হয় তখন তাকে **বায়োফার্মিং** বলে। i. জীবন রক্ষাকারী antithrombin এখন অতি অল্প খরচে ছাগলের মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে। ii. GMO ছাগলের দুধ থেকে শক্তিশালী spider silk উৎপাদন করা হচ্ছে। iii. ইনসুলিন এখন কুসুম ফুলের বীজের মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য হয়েছে।

৪. **জিন থেরাপি (Gene therapy) :** কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সঠিক করার (to correct) পদ্ধতি হলো **জিন থেরাপি**। ত্রুটিপূর্ণ জিনটিকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সরিয়ে দিয়ে ঐ জায়গায় corrected জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। দু'টি উপায়ে এটি করা হয়ে থাকে, যথা : i. গবেষণাগারে corrected জিন সম্বলিত কোষকে জন্মিয়ে রোগীর দেহে ইনজেক্ট করা হয়, অথবা ii. একটি বাহক (vector), সাধারণ একটি ভাইরাসকে corrected জিনসহ মানুষের DNA বহন করার জন্য পরিবর্তন করা হয় এবং তাকে সরাসরি মানুষের টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়। টার্গেট কোষে তখন corrected DNA সংযুক্ত হয়ে যায় এবং রোগ মুক্ত করে।

ভাইরাস কোনো কোষে প্রবেশ করে তার নিজস্ব DNA কে আক্রান্ত কোষের ক্রোমোজোমে সংযুক্ত করতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে– i. ভাইরাসের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কোষে ড্রাগ প্রবেশ করানো যায়। ii. কাঙ্ক্ষিত জিন প্রবেশ করানো হয় এবং iii. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৫. **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন :** সাধারণত অণুজীব থেকে (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে অ্যান্টিবায়োটক উৎপাদন করা হয়। জীবপ্রযুক্তিতে প্রায় এক হাজারের মতো অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হচ্ছে। যেমন– Penicillin, Cephalosporin, Bactrocin, Amoxicillin, Streptomycin, Tetracyclin ইত্যাদি।

৬. **গর্ভের শিশু পরীক্ষা :** মাতৃগর্ভে শিশুর কোনো অস্বাভাবিকতা **অ্যামনিওসিস** (amniosis) জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিরূপণ করা যায়।

৭. **মলিকুলার ফার্মিং :** রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ট্রান্সজেনিক প্রাণিদের রক্ত, মল, মূত্র ও দুধ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা যায়। ওষুধ আহরণের এ প্রক্রিয়াকে **মলিকুলার ফার্মিং** (molecular farming) বলে। ট্রান্সজেনিক ছাগলের দুধ থেকে TPA (tissue plasminogen activetor) পাওয়া যায়।

৮. **বংশগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা :** বংশগত Autosomal dominent বর্তমানে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব।

৯. **গ্লাইকোপ্রোটিন AAT উৎপাদন :** গ্লাইকোপ্রোটিন AAT (a-1-antitrypsin) মানুষের যকৃতে উৎপন্ন হয়। ট্রান্সজেনিক ভেড়ার দুধ থেকে AAT সংগ্রহ করা হচ্ছে। মানুষের ফুসফুসের **এমফাইসেমা** (emphysema) রোগের চিকিৎসায় AAT ব্যবহার করা হয়।

১০. **জেনেটিক ডিসঅর্ডার দূরীকরণ :** মানবদেহের প্রায় ৩,৫০০টি জেনেটিক ডিসঅর্ডার রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করার চেষ্টা চলছে।

১১. **মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি :** কোনো বিজাতীয় পদার্থ (সাধারণত প্রোটিন জাতীয়) মানুষের দেহে প্রবেশ করলে যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে **অ্যান্টিবডি** (antibody) বলে এবং বিজাতীয় পদার্থকে **অ্যান্টিজেন** (antigen) বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রভাবে যে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাকে **মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি** (monoclonal antibody) বলে। এটি জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন করে মাতৃত্ব নির্ণয়ে, রোগ নির্ণয়ে, রোগ নিরাময়ে ও প্রতিস্থাপিত অঙ্গের প্রত্যাখ্যান রোধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

CamScanner

১২. হিমোফিলিয়া রোগে : এই রোগটি একটি জন্মগত ব্যাধি। এ রোগের ফলে কোনো স্থান কেটে গেলে তাতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। কারণ কিছু ফ্যাক্টর জিন (factor gene) এ কাজে বাধা সৃষ্টি করে। জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়াকে ভেড়ার দেহকোষে প্রবেশ করিয়ে দুধের মাধ্যমে ফ্যাক্টর জিনগুলোকে আলাদা করে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১৩. এনজাইম উৎপাদন : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে যে ইঞ্জিনিয়ার্ড এনজাইম (engineered enzyme) উৎপাদন করা হচ্ছে তা চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত কয়েকটি ওষুধ ও এদের ব্যবহার

ওষুধ	প্রয়োগ
১. ইনসুলিন	ডায়বেটিস চিকিৎসায়
২. হিউমেন ইউরোকাইনেজ	রক্ত সংবহন জটিলতা, প্লাজমিনোজেন সক্রিয়ক
৩. ইন্টারফেরন	ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণে
৪. র‍্যাবিস ভাইরাস অ্যান্টিজেন	জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায়
৫. টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর (tPA)	হৃদরোগ চিকিৎসায়
৬. সোমাটোস্ট্যাটিন	বামনত্ব চিকিৎসায়
৭. হিউমেন ফ্যাক্টর IV	হিমোফিলিয়ার চিকিৎসায়
৮. লিম্ফোলাইনস	স্বয়ংক্রিয় ইমিউন কার্যকারিতায়
৯. সেরাম অ্যালবুমিন	শল্য চিকিৎসায়

ইনসুলিন (Insulin)

ইনসুলিন একটি হরমোন যা মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয়ের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans)- এর β (বিটা) কোষ থেকে নিঃসৃত হয়। এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$ ও আণবিক ভর 5734। **Sir Edward Sharpey-Schafer** সর্বপ্রথম ১৯১৬ সালে ইনসুলিন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। মানুষের ইনসুলিনে ১৭ ধরনের মোট ৫১টি অ্যামিনো এসিড থাকে। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (A-চেইন ও B-চেইন) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। ইনসুলিনের A-চেইনে ২১টি অ্যামিনো এসিড, B-চেইনে ৩০টি অ্যামিনো এসিড থাকে। এটি গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক রাখে। কোনো কারণে (i) অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে (ii) কম নিঃসৃত হলে (iii) নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে কিংবা স্বল্প পরিমাণ নিঃসৃত হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ **ডায়াবেটিস** রোগ হয়। ডায়াবেটিক রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়।

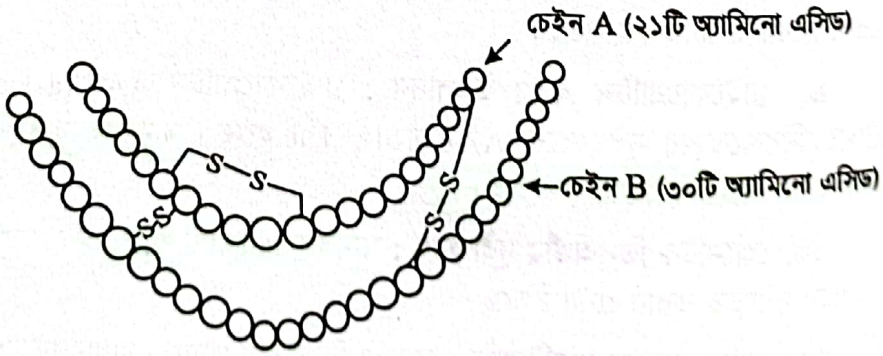

চিত্র ১১.৯ : ইনসুলিনের A ও B চেইন; দুটি সিস্টিনের মধ্যে ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয়।

CamScanner

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের জন্য ইনসুলিন উৎপাদন তত্ত্ব

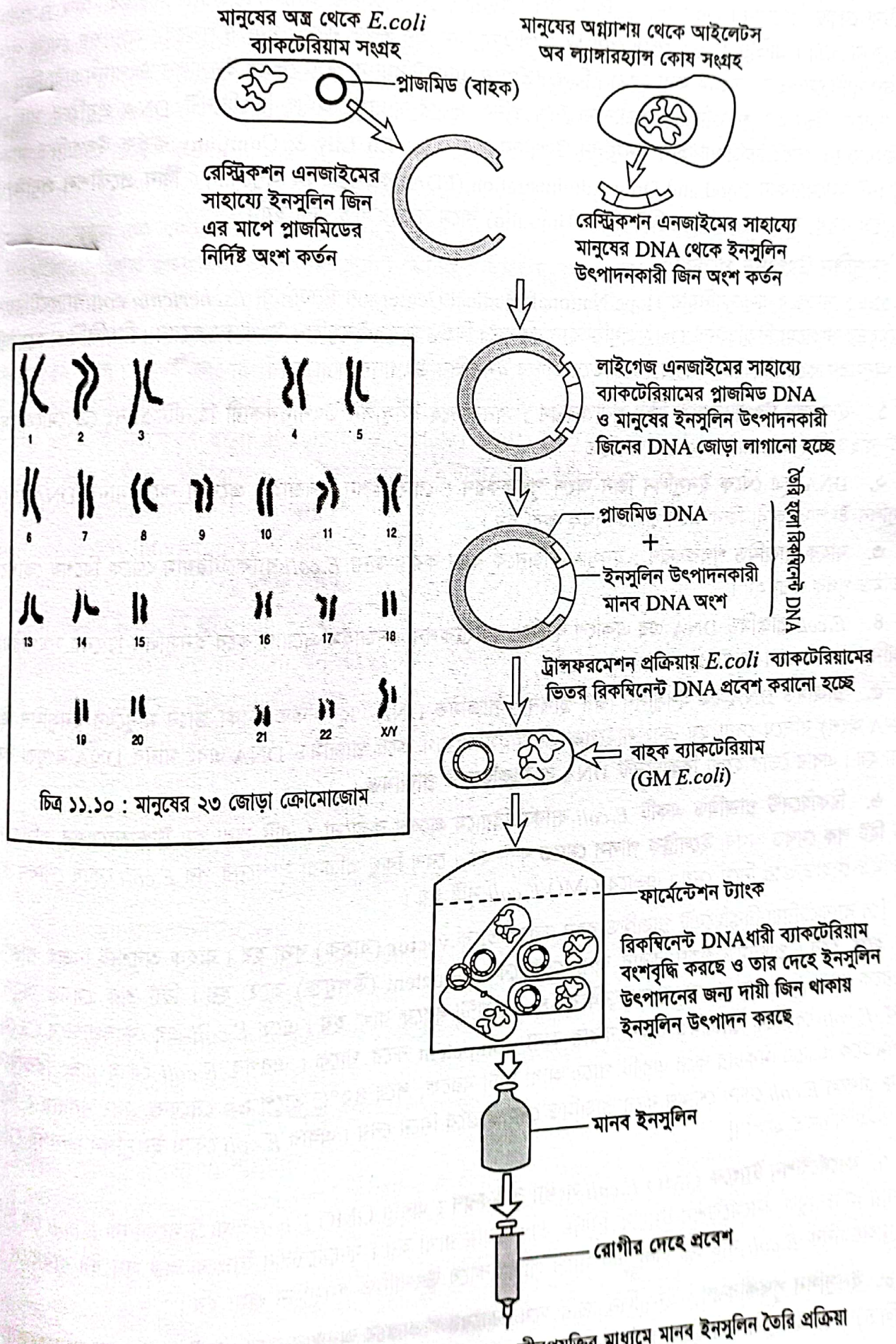

চিত্র ১১.১১ : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন তৈরি প্রক্রিয়া

চিত্র ১১.১০ : মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম

মানুষের ১১নং ক্রোমোজোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত ইনসুলিনের **জেনেটিক কোড** বিদ্যমান। এর মধ্যে ৬৩টি নিউক্লিওটাইড A-চেইন তৈরির জন্য এবং ৯০টি নিউক্লিওটাইড B-চেইন তৈরির জন্য দায়ী। প্রতিটি *E.coli* কোষ প্রায় ১০ লাখ ইনসুলিন অণু প্রস্তুত করে। গরু ও শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে পূর্বে ইনসুলিন বাণিজ্যিকভাবে সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে ব্যাকটেরিয়া বা ঈস্ট কোষে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন বা অন্য কোনো জিন প্রবেশ করিয়ে অণুজীবকে ট্রান্সজেনিক করার মাধ্যমে অর্থাৎ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়। **Eli Lily & Company** কর্তৃক উৎপাদিত মানব ইনসুলিনই আমেরিকার Food and Drug Administration (FDA) কর্তৃক প্রথম অনুমোদিত জিন প্রকৌশল প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ওষুধ, যা ১৯৮২ সালে **হিউমুলিন** (Humulin) নামে বাজারজাত করা হয়।

ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়া

১৯৮১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার Hope National Medical Center-এর বিজ্ঞানীরা *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সাহায্যে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিন উৎপাদন করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে রিকম্বিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে মানব ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়।

১. **ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ :** মানবদেহে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটি ১১নং ক্রোমোজোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA-তে অবস্থিত।

২. **DNA সূত্র থেকে ইনসুলিন জিন অংশ পৃথককরণ :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে মানব DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ কেটে পৃথক করা হয়।

৩. **বাহক প্লাজমিড পৃথককরণ :** ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E.coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে বিশেষ কৌশলে প্লাজমিড পৃথক করা হয়।

৪. ***E.coli* প্লাজমিড DNA-এর একাংশ কর্তন :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে ইনসুলিন জিনের সমপরিমাণ প্লাজমিড DNA অংশ কেটে স্থান ফাঁকা করা হয়।

৫. **প্লাজমিড DNA-তে ইনসুলিন জিন স্থাপন :** প্লাজমিড DNA-এর কর্তিত ফাঁকা স্থানে মানুষের ইনসুলিন জিন (DNA অংশ) বসিয়ে দেয়া হয় এবং **লাইগেজ** এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাজমিড DNA এবং মানব DNA সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এবার তৈরি হলো **রিকম্বিনেন্ট DNA** বা **রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড**।

৬. **রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড একটি *E.coli* ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো :** এটি করা হয় **ট্রান্সফরমেশন** প্রক্রিয়ায়। এটি **হিট শক মেথড** অথবা **ইলেক্ট্রিক পালস মেথড** করা হয়। বেশ কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর *E.coli* কোষ শোষণ করে প্লাজমিড দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। এভাবে GMO *E.coli* সৃষ্টি হয়।

[যে ব্যাকটেরিয়া রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড বহন করবে তাকে **vector** (বাহক) বলা হয়। বাহক অবশ্যই নিজস্ব প্লাজমিড মুক্ত হতে হবে। প্লাজমিড গ্রহণ করার জন্য ভেক্টরকে competent (উপযুক্ত) হতে হয়। হিট শক মেথড অনুসারে ভেক্টরকে *(E.coli)* প্রথমে $CaCl_2$ দ্রবণে ডুবিয়ে ১৪–১৬ ঘণ্টা বরফে রাখা হয়। এতে *E.coli*-এর কোষপ্রাচীরে Ca লেগে থেকে *E.coli* কোষকে প্লাজমিড গ্রহণ করার জন্য competent করে থাকে। এরপর *E.coli* কোষ এবং রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডকে একত্রে মিকচার করে একটি পাত্রে আধা ঘণ্টা বরফে, পরে ৪২°C তাপে ৯০ সেকেন্ড এবং পুনরায় ২ মিনিট বরফে রাখলে *E.coli* কোষ শোষণ করে প্লাজমিড দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। এবার *E.coli* কোষ ইনসুলিন জিনসহ GMO *E.coli*-এ পরিণত হলো।]

৭. **ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে GMO *E.coli* সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ :** এবার GMO *E.coli* তথা ট্রান্সজেনিক *E.coli* কে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াযুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক *E.coli* সৃষ্টি হয় এবং এর সাথে প্রতি কোষে উৎপাদিত ইনসুলিন জমা হয়।

৮. **ইনসুলিন পৃথকীকরণ :** ইনসুলিন তৈরি হয়ে কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তাই *E.coli* কোষসমূহকে lysis (বিগলিত) করে ইনসুলিন আহরণ করা হয়।

CamScanner

৯. ইনসুলিন বিশুদ্ধকরণ : ব্যাকটেরিয়াকে বিগলন করার মাধ্যমে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তাতে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব অনেক প্রোটিনও থাকা স্বাভাবিক। তাই আহরিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করা হয়।

১০. ইনসুলিন বাজারজাতকরণ : উৎপাদন পরবর্তীতে বিশুদ্ধ ইনসুলিন উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত করা হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে প্রবেশ করানো হয়। [দেহে ইনসুলিন রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভিতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।]

ইন্টারফেরন (Interferon)

ইন্টারফেরন এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন (প্রায় ২০-৩০ হাজার ডাল্টন) সম্পন্ন প্রোটিন (গ্লাইকোপ্রোটিন), যা T-লিম্ফোসাইট, শ্বেত রক্তকণিকা এবং ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। এটি প্রধানত ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করে, তবে ক্যান্সার কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতেও বাধা দেয়। ইন্টারফেরন (interferon) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে interference অর্থাৎ ব্যাঘাত থেকে। **দেহের ভিতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি ভাইরাসজনিত আক্রমণ প্রতিরোধী প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে ইন্টারফেরন বলে।** একই দেহের বিভিন্ন টিস্যু (যেমন–শ্বেত রক্তকণিকা, ফাইব্রোব্লাস্ট ইত্যাদি) থেকে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারফেরন তৈরী হতে দেখা যায়। এটি প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র যা দেহের ইমিউন সিস্টেমের অন্তর্গত অর্থাৎ ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন। ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Alick Isaac's** এবং **Jean Lindermann** সর্বপ্রথম ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন। ইন্টারফেরন একটি নির্দিষ্ট হরমোন, যা মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিনের একটি গ্রুপ। ভৌত রাসায়নিক ও অ্যান্টিজেনিক গুণের ভিত্তিতে ইন্টারফেরন তিন ধরনের. যথা–Interferon-α, Interferon-β এবং Interferon-γ। প্রতিটি ঈস্ট কোষে ১ মিলিয়ন (১০ লাখ) অণু ইন্টারফেরন তৈরি হয় এবং অপরদিকে *E.coli* এর ভিতর 10×10^5 অণু তৈরী হয়।

ইন্টারফেরন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ

নিম্নলিখিত জীবপ্রযুক্তির ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মানব ইন্টারফেরন উৎপাদন করা হয়–

১. শুরুতে মানুষের **ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ** থেকে DNA সংগ্রহ করে তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে পৃথক করা হয়।
২. প্লাজমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।
৩. এবার ইন্টারফেরন জিন অংশকে **লাইগেজ** এনজাইম দিয়ে প্লাজমিডের কাটা (ফাঁকা) অংশে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একটি **রিকম্বিনেন্ট DNA অণু** তৈরি করা হয়।
৪. প্লাজমিড মুক্ত *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে ইন্টারফেরন জিনযুক্ত রিকম্বিনেরন্ট DNA কে প্রবেশ করানো হয়, ফলে তৈরি হয় **ট্রান্সজেনিক** *E.coli*।
৫. ট্রান্সজেনিক *E.coli* কে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে তাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়।
৬. *E.coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টাফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।
৭. আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।
৮. বিশেষ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে উৎপাদিত ও বাজারজাত বহুল প্রচলিত একটি ইন্টারফেরন হলো Betaferon.

ইন্টারফেরনের গুরুত্ব ও ব্যবহার

i. ইন্টারফেরন দেহাভ্যন্তরে ভাইরাসের বিভাজনকে (সংখ্যাবৃদ্ধি) রোধ করে। ii. ইমিউন সিস্টেমকে (অনাক্রম্যতন্ত্র) নিয়ন্ত্রণ করে। iii. পোষকের অনাক্রম্য কোষকে উত্তেজিত করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। iv. B ও T-লিম্ফোসাইটের সংখ্যাবৃদ্ধি দমন করে। v. NR-কোষ (Natural Killer Cells) এর ক্ষমতা ও সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বাধা দেয়। vi. ভাইরাসজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। vii. অ্যান্টিবডি উৎপাদন প্রতিরোধ করে। viii. বর্তমানে *E.coli* ও ঈস্ট থেকে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারফেরন উৎপাদন হচ্ছে, যা হেপাটাইটিস-বি,

CamScanner

হার্পিস সংক্রমণ, প্যাপিলোমিয়া, জলাতঙ্ক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি নাসিকাপথে, পেশিতে বা রক্তস্রোতেও প্রয়োগ করা হয়।

TPA বা tPA (Tissue Plasminogen Activator)

TPA (টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাকটিভেটর) প্রোটিনধর্মী পদার্থ। এরা রক্তের নিষ্ক্রিয় প্লাজমিনোজেনকে সক্রিয় প্লাজমিনে পরিণত করতে পারে। মানুষের রক্তে **প্লাজমিন** নামক এনজাইমটি নিষ্ক্রিয় ও কর্মহীন অবস্থায় প্লাজমিনোজেন হিসেবে বিরাজ করে। রক্তনালিতে TPA ইনজেক্ট করলে প্লাজমিনোজেন সক্রিয় হয়ে প্লাজমিনে পরিণত হয়, যা জমাট বাঁধা রক্তকে গলিয়ে দিতে পারে। জমাট বাঁধা রক্তকে গলানোর এ প্রক্রিয়াকে **ফাইব্রিনোলাইসিস** (fibrinolysis) বলে। মানুষের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে TPA ব্যবহার করে ফাইব্রিনোলাইসিস ঘটানো হয়। ১৯৭০ সালের দিকে জমাট বাঁধা রক্তকে গলাতে ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত **স্ট্রেপটোকাইনেজ** (streptokinase) নামক এনজাইম ব্যবহৃত হতো, কিন্তু এটি বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। TPA ব্যবহার করলে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না।

TPA তৈরি প্রক্রিয়া :

i. মানুষের কোষ থেকে TPA জিন এর mRNA পৃথক করা।
ii. mRNA থেকে cDNA তৈরি করা।
iii. cDNA-কে উপযুক্ত প্লাজমিডে অন্তর্ভুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা।
iv. রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো।
v. আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E.coli* কে আবাদ করে হাজার হাজার কপি (ক্লোনিং) করা।
vi. *E.coli* থেকে TPA প্রোটিন পৃথক করে ওষুধ হিসেবে তৈরি করা।
vii. হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর রোগীর রক্তনালিতে TPA ইনজেক্ট করলে রক্তের ব্লক বিগলিত হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।
viii. TPA নিঃসরণকারী জিন মানুষের দেহ থেকে নেয়া বলে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO)

কিডনিতে (বৃক্ক) উৎপন্ন যে হরমোন অস্থিমজ্জা (bone marrow)-এর কোষকে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাকে **ইরিথ্রোপোইটিন** (EPO) বলে। RBC তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ইরিথ্রোপোইসিস** (erythropoiesis)। কাজেই সহজভাবে বলা যায়, **কিডনিতে উৎপন্ন যে হরমোন ইরিথ্রোপোইসিস ঘটায় তাকেই ইরথ্রোপোইটিন বলে**। উল্লেখ্য যে, ভ্রূণীয় অবস্থায় যকৃতে (liver) ইরিথ্রোপোইটিন সৃষ্টি হয়। কিডনি ডায়ালাইসিস করলে রক্ত থেকে EPO বের হয়ে যায়, এর ফলে রোগীর দেহে RBC কমে যায় এবং রক্তশূন্যতা ঘটে। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে EPO তৈরি করা যায়।

EPO তৈরির প্রক্রিয়া

১. মানুষের দেহ থেকে EPO সৃষ্টির জন্য দায়ী জিন (কাঙ্ক্ষিত জিন) পৃথক করা হয়।
২. উপযুক্ত প্লাজমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে তাতে DNA ligase এর সহায়তায় ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন সংযুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয়।
৩. অতঃপর রিকম্বিনেন্ট DNA-কে ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় পোষক *E.coli* -এর কোষে প্রবেশ করানো হয়।
৪. এরপর কালচার মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA-সহ *E.coli*-আবাদ করে সংখ্যাবৃদ্ধি (ক্লোনিং) করা হয়।
৫. এসব ব্যাকটেরীয় **ক্লোন** (*E.coli*) থেকে EPO সংগ্রহ করে ওষুধ হিসেবে বাজারজাত করা হয়। এরূপ একটি EPO-এর বাণিজ্যিক নাম **Epogen**।

ইরিথ্রোপোইটিনের ব্যবহার : কিডনীরোগীকে EPO ইনজেকশন দিয়ে রক্তশূন্যতা দূর করা সম্ভব হয়।

CamScanner

গ. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environmental Management)

যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী উপাদানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় বা উপাদানগুলোকে পুনঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজে লাগানো যায় বা উপস্থিত পরিবেশকে উন্নত করা যায়, তাকেই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে। মানুষ আজ যতই সভ্যতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ততই মনুষ্য সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। সেই সংকট হচ্ছে পরিবেশ দূষণ সমস্যা। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নগরী স্থাপন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন প্রভৃতি পরিবেশ সংকটের প্রধান কারণ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে সাগরে তেল নির্গমন এবং মানুষের পরিত্যক্ত জৈব ও অজৈব পদার্থসামগ্রীর সুব্যবস্থাপনার অভাবে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। যার ফলে পরিবেশের বায়ু, পানি ও ভূমি কোনোটাই আজ দূষণমুক্ত নয়।

সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ক. কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য : কলকারখানা ও খনি থেকে বাষ্পাকারে নির্গত SO_2, CO_2, CO, NO, NH_4, Cl_2 প্রভৃতি গ্যাস বাতাসকে দূষিত করে এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কলকারখানা থেকে নির্গত সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার এবং জিঙ্ক অত্যন্ত বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী দূষিত পদার্থ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন অণুজীব জন্মায় এবং বর্জ্যপদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে। জার্মানিতে অ্যালুমিনিয়াম কারখানার বর্জ্যপদার্থ থেকে **ফেরিক্স** তৈরী করা হয়। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান এবং ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা **single cell protein** হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবের সহায়তায় দুধের (diary) কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য (whey) থেকে **ল্যাকটিক এসিড** তৈরি করা হয়। কাগজ শিল্পের

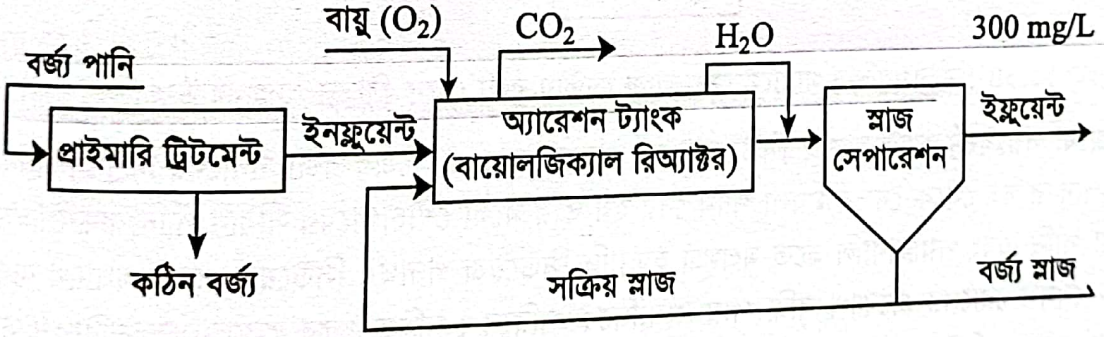

চিত্র ১১.১২ : শিল্প নির্গত বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার ফ্লোচার্ট

কাঁচামাল ব্লিচ করতে **ক্লোরিন** ব্যবহৃত হয়। এ ক্লোরিনজনিত দূষণ থেকে পরিবেশকে বিভিন্ন ছত্রাক ব্যবহার করে সহজেই মুক্ত করা যায়। পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্যকেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে উপকারী সরল দ্রব্যে রূপান্তর করা যায়, ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন–বিভিন্ন জৈব এসিড (অ্যাসিটিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, টারটারিক এসিড ইত্যাদি), ইথানল, প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামিনো এসিড, অ্যাসিটোন, গ্লিসারিন, গ্লুটানল ইত্যাদি।

খ. সমুদ্রে তেল নির্গমন : বড় বড় বন্দরে তেলবাহী জাহাজ থেকে নিঃসৃত পেট্রোল, ডিজেল বা অপরিশোধিত তেল পানিকে দূষিত করে। এ দূষণ নদী বা সমুদ্রে বসবাসরত অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাগরে চালিত তেলবাহী সুপার ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনায় কবলিত হলে, ট্যাঙ্কারের তেল সাগরে পুরু আস্তরনের সৃষ্টি করে। ঐ তেলের সংস্পর্শে এলে অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এ ধরনের দূষণ রোধে বর্তমানে ক্ষুদ্র অণুজীব ব্যবহার করা হচ্ছে।

CamScanner

Pseudomonas putida নামক এক প্রকার অণুজীব চারটি প্রধান হাইড্রোকার্বনকে (কর্পূর, অকটেন, জাইলিন ও ন্যাপথালিন) ভেঙে ফেলতে পারে। এর কয়েকটি স্ট্রেইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় এবং এ স্ট্রেইনগুলো মাল্টিপ্লাজমিডযুক্ত। *Pseudomonas*-এর এ স্ট্রেইনগুলো C_6 থেকে C_{18} পর্যন্ত দীর্ঘ অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন ভেঙে দিতে পারে। বর্তমানে সমুদ্রে নিঃসৃত তেল নিষ্কাশন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য *Pseudomonas*, *Mycobacterium*, *Nocardia* ইত্যাদি অণুজীব ব্যবহার করা হয়।

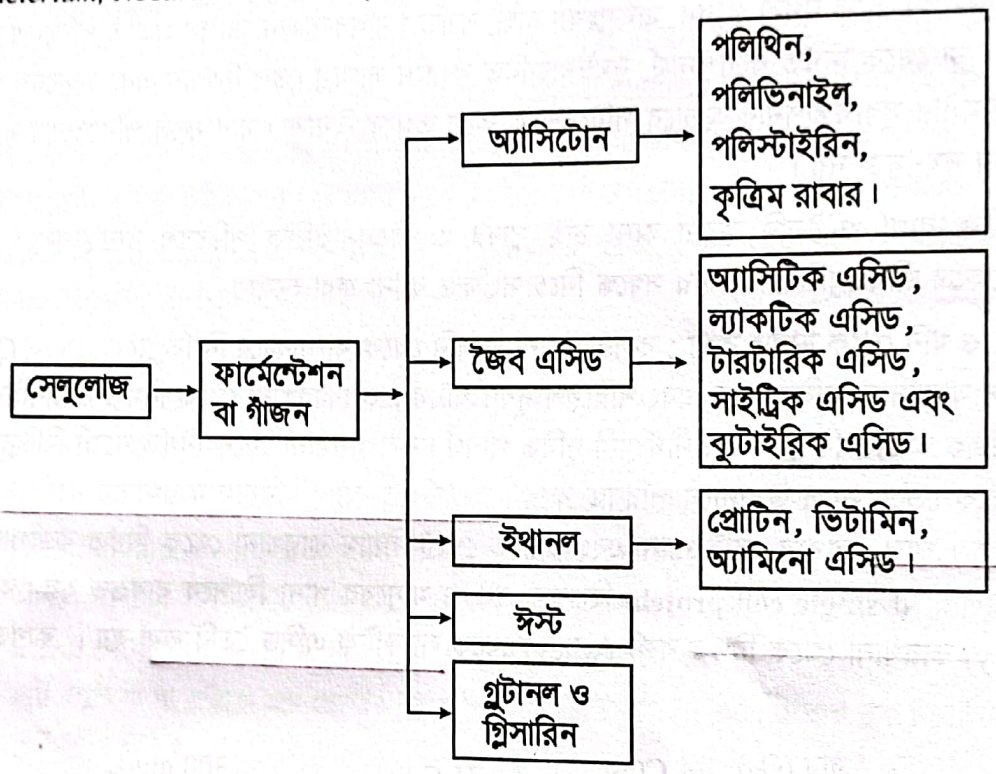

চিত্র ১১.১৪ : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন

গ. সিউয়েজ বা পয়ঃবর্জ্য আত্তীকরণ : সিউয়েজ এক প্রকার জৈব ও অজৈব বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণ। এসব পদার্থের মধ্যে আবাসিক এলাকার গৃহ থেকে যেসব ময়লা পানি বের হয় তার মধ্যে শৌচাগারের সাবান পানি, রন্ধনশালার খাদ্যের অবশিষ্টাংশ, ময়লা পানি এবং পয়ঃপ্রণালি হতে মলমূত্র ইত্যাদি সিউয়েজ পদার্থ। সিউয়েজ পদার্থ যথাযথ ব্যবহার করা না হলে একদিকে যেমন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে পরিবেশ দূষিত করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে সিউয়েজ আত্তীকরণের পরিকল্পিত ব্যবস্থা আছে; যেমন– সেপটিক ট্যাংক, অক্সিডেশন পুকুর বা ট্যাংক, ফিল্টার বেড পানি, বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট, মিউনিসিপাল সিউয়েজ শোধনাগার বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি। সিউয়েজ এর জৈব পদার্থ বায়বীয় বা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়াসহ শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া কর্তৃক ভেঙ্গে CO_2 ও CH_4 - এ পরিণত করে। CH_4 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পৃথিবীর বেশ কয়েকটি উন্নত দেশে সিউয়েজের পদার্থগুলো শহরের বর্জ্য অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে সংমিশ্রণ করে তিনটি পদ্ধতিতে আত্তীকরণ করা হয়। যথা–

১. পানিতে অদ্রবীভূত শক্ত ও বৃহৎ অংশগুলোকে পৃথক করে উচ্চতাপের স্টিম প্রবাহের মাধ্যমে এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে জীবাণুমুক্ত পাউডারে পরিণত করা হয়। ঐ পাউডারগুলোকে নির্ধারিত আকৃতিবিশিষ্ট দানায় রূপান্তর করা হয়। এটি একটি মূল্যবান জৈব ও অজৈব মিশ্র সার।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্রবীভূত অংশটিতে বায়ুপ্রবাহ ও ব্যাকটেরিয়া সংযোগে পচন প্রক্রিয়ায় উপাদানগুলোকে মুক্ত করা হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফেট ও পানি নির্গত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ ভাগে পানিকে ক্লোরিনযুক্ত (chlorinated) করে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত করা হয়।

CamScanner

৩. তৃতীয় পর্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা পানিকে নাইট্রেটস ও ফসফেটস মুক্ত করে পরিষ্কার পানিতে রূপান্তর করা হয়। এ ধরনের সিউয়েজ আত্তীকরণের প্রথম পর্যায়টি যান্ত্রিক, দ্বিতীয়টি জৈবপ্রযুক্তি এবং তৃতীয়টি রাসায়নিক পরিশোধন। জৈবপ্রযুক্তি দ্বারা জৈব যৌগের পচনে *Nitrosomonas, Nitrobacter, Clostridium, Protozoa* প্রভৃতি অণুজীবকে ব্যবহার করা হয়। নাইট্রোজেন বিমুক্তকারী ব্যাকটেরিয়া যেমন– *Bacillus denitrificans.*

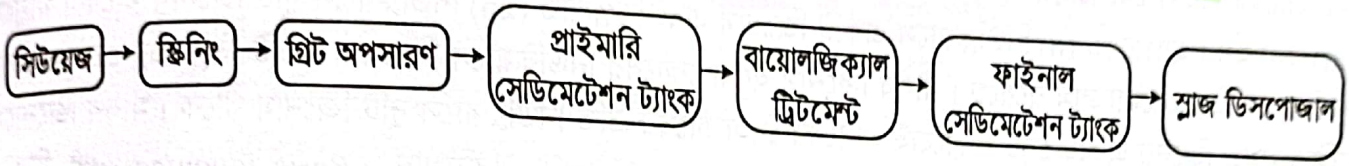

চিত্র ১১.১৩ : সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া

Pseudomonas, Micrococcus প্রভৃতি সিউয়েজ উপাদানগুলোর নাইট্রেট যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে নাইট্রোজেনে পরিণত করে। সবাত শ্বসন ব্যাকটেরিয়া (*Azotobacoter*), অবাত শ্বসন ব্যাকটেরিয়া (*Clostridium*), সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া (*Chlorobium, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas*) প্রভৃতি সিউয়েজের উপাদানগুলোকে বিশ্লিষ্ট করে তরল পদার্থে পরিণত করে। এসব তরল পদার্থে বিভিন্ন ধরনের শৈবালের আবাদ করা হয়। ড্রেনের ময়লা পচন প্রক্রিয়ায় *Enterobactor, E,coli, Pseudomonas, Zooglea ramigera* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ময়লা ও আবর্জনার পচন ঘটিয়ে তরল পদার্থে পরিণত করে। এগুলো যথাযথ পরিশোধনের পরে মূল্যবান জৈব সারে পরিণত করা হয়।

জীব প্রযুক্তির সম্ভাবনা (Prospects of Biotechnology)

সারা বিশ্বের অনেক সমস্যা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের যত্ন, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ। নিচে জীবপ্রযুক্তির কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো।

১. জিন থেরাপি ও আরএনএআই (Gene therapy & RNAi) : বংশগতীয় রোগ, ক্যান্সার এবং কিছু সংক্রামক জটিল রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপির প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনকে corrected জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এসব জিনের বাহক হিসেবে ভাইরাস, RNAi ও জিঙ্ক ফিঙ্গার প্রোটিন ব্যবহার করা হয়।

২. মাইক্রো আরএনএ (Micro RNA) : ক্যান্সার, ভাইরাস সংক্রমণ, এসব রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো আরএনএ-এর ব্যবহার হতে পারে জীবপ্রযুক্তির এক বিশেষ প্রয়োগ। এটি রোগ সৃষ্টিকারী জিনের কাজকে প্রতিরোধ করে।

৩. স্টেম সেল : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্টেম সেল কোষ সৃষ্টি করে হারানো অঙ্গের প্রতিস্থাপন, যেকোনো অঙ্গের কোষ তৈরি, নতুন ওষুধের পরীক্ষা ইত্যাদি পূর্বের চেয়ে সহজতর হয়েছে।

৪. জিনোম স্ক্যানিং : জিনোম স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত যে কোনো জীবের জিনোম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হবে।

৫. ন্যানোটেকনোলজি : চাহিদা অনুসারে জৈববস্তুর উৎপাদন করার জন্য ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হবে।

৬. GM অণুজীব ব্যবহার করে পরিবেশের দূষণমাত্রা রোধ করা সম্ভব হবে।

৭. জীবপ্রযুক্তি কৃষকের বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করছে। নিকট ভবিষ্যতে কম দূষকযুক্ত কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

CamScanner

জিনোম সিকোয়েন্সিং (Genome Sequencing)

একটি জীবের এক সেট ক্রোমোজোমে অবস্থিত সকল জিনসহ পূর্ণাঙ্গ DNA-ই **জিনোম**। সহজ কথায়, **একটি জীবকোষে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে একত্রে জিনোম বলা হয়**। জিনোমই জীবের জেনেটিক বা বংশগতীয় তথ্য ভাণ্ডার এবং এটিই জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের নীলনকশা (blue print) ধারণ করে, এজন্য জিনোমকে **মাস্টার ব্লু-প্রিন্ট** (master blue print) বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে একটি জিনোম এবং ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ২৩টি ক্রোমোজোম রয়েছে। মানব জিনোম হলো কোষের নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান ২৩টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত সমস্ত জিনের একটি সেট। কাজেই মানুষের দেহকোষের প্রতি নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানব জিনোমের সকল জিনে প্রায় ৩ বিলিয়ন **ক্ষার যুগল** বা **বেসপেয়ার** (base pair) বিদ্যমান। *Paris japonica* -এর জিনোম উদ্ভিদজগতে দীর্ঘতম, এতে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন বেস পেয়ার রয়েছে। *Paris japonica*- এর একটি কোষের জেনেটিক তথ্য একলাইনে জোড়া লাগালে তা ৩২৮ ফুট লম্বা হবে।

২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসি বিজ্ঞানী **ইমানুয়েল কার্পেন্টার** ও মার্কিন বিজ্ঞানী **জেনিফার এ ডৌডানা**। জিনোম সম্পাদনার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এ প্রযুক্তির নাম হলো **ক্রিসপার ক্যাস নাইল জেনেটিক সিজার্স**।

সাধারণত অসংখ্য নিউক্লিওটাইড বিভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে DNA অণু গঠন করে। এক অণু ডিঅক্সিরাইবোজ শুগার, এক অণু নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডিনিন = A, গুয়ানিন = G, থাইমিন = T এবং সাইটোসিন = C) এবং এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক একটি **নিউক্লিওটাইড** গঠিত হয়। A, G, C ও T -কে 'Chemical alphabet of life' বলা হয়। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলো কোন অনুক্রমে (কোনটির পর কোনটি) সজ্জিত থাকে তা হলো **জিনোম সিকোয়েন্স,** আর এই সিকোয়েন্সটি (সাজানো পদ্ধতিটি) উদঘাটন করাই হলো **জিনোম সিকোয়েন্সিং** বা **DNA সিকোয়েন্সিং।**

একটি DNA স্ট্র্যান্ড-এর বেস-পেয়ার (basepairs) সাজানো ক্রম যে প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা হয় তাকে DNA সিকোয়েন্সিং বলে (A process in which the sequence of basepairs in a DNA strands is determined, is known as DNA sequencing.)।

জিনোম সিকোয়েন্সিং এর ব্যাবহৃত নমুনা : আবরণী কোষ, অস্থিমজ্জা, লালা, সিমেন বা বীর্যরস, চুলের ফলিকল, উদ্ভিদের বীজ, পাতা অথবা DNA বিশিষ্ট যেকোনো কোষ জিনোম সিকোয়েন্সিং-এ ব্যবহৃত হতে পারে।

আবিষ্কার ও প্রক্রিয়া : 1976 সালে সর্বপ্রথম MS2 ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়, তবে এটা ছিল RNA সিকোয়েন্সিং। 1977 সালে ϕ–X174 ভাইরাসের জিনোমের সম্পূর্ণ জিনোম সিকেয়েন্সিং হলো প্রথম DNA সিকোয়েন্স। লম্বা DNA -কে কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত করে প্রথমে খণ্ডগুলোর সিকোয়েন্সিং করা হয়। পরে একসাথে মিলিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্সিং উপস্থাপন করা হয়। জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রবর্তক হলেন ব্রিটিশ রসায়নবিদ **Dr. F. Sanger** (1977) । এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 1980 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

১. নির্দিষ্ট DNA অণুকে প্রাথমিকভাবে রিয়েজেন্ট সমৃদ্ধ চারটি টেস্টটিউবে ভাগ করে দেয়া হয়, সেখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি DNA খণ্ডের (A, G, C, T) রেসিডিউ শনাক্ত করবে।

২. **জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস** পদ্ধতিতে পাশাপাশি চারটি বিক্রিয়ার প্রতিটিকে পৃথক করা হয় এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ ব্যান্ড এর স্থান ও পরিমাণ (size) থেকে সিকোয়েন্স নির্ণয় করা হয়।

৩. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত X-ray স্ক্যানার ব্যবহার করে ইলেক্ট্রোফোরেসিস এর রেজাল্ট বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

CamScanner

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বা জিনোম সিকোয়েন্সিং

বাংলাদেশি বিজ্ঞানী **ড. মাকসুদুল আলম** ও তাঁর সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি। এরা কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা হয়েছে। জিনোম সিকোয়েন্সিং জানার ফলে উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, শীতকালীন পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট, স্বল্প জীবনকাল পাট, ক্ষরা সহিষ্ণু পাট, ওষুধী পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। কিছুদিন আগে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

জিনোম সিকোয়েন্সিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের ভাবনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক **হলুদ মোজাইক ভাইরাস** এর জিনোম সিকোয়েন্সি করেছেন। ফলে মুগডাল এ ভাইরাস প্রতিরোধী হবে এবং পাতা কোকড়ানো রোগ থেকে টমেটো রক্ষা পাবে। করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং এ অবদান রেখেছে কিছু প্রতিষ্ঠান। তৎমধ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা (BCSIR) প্রতিষ্ঠান প্রধান।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য

জীবের নাম	ক্রোমোজোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	বেসপেয়ার (basepair)
E.coli (১৯৯৭ সালে এর জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়)	1	3200	4.6 মিলিয়ন
Haemophilus influenzae (ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রথম)	1	1700	1.8 মিলিয়ন
Saccharomyces cerevisiae (ঈস্ট, সুকেন্দ্রিক জীবের মধ্যে সর্বপ্রথম)	16	6000	12.1 মিলিয়ন
Caenorhabditis elegans (নিমাটোড, বহুকোষী প্রাণীর মধ্যে সর্বপ্রথম)	6	20000	100 মিলিয়ন
Arabidopsis thaliana (পুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বপ্রথম)	10	25000	100 মিলিয়ন
Homo sapiens (মানুষ, ২০০৩ সালে চূড়ান্ত প্রজেক্ট প্রকাশিত হয়; এখনো কাজ চলছে)	46	25000 (+বহু অপ্রকাশিত)	3.2 বিলিয়ন

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger prints)

DNA finger prints বলতে মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। DNA অনেকগুলো নিউক্লিওটাইডের সমন্বয়ে গঠিত। DNA এর নিউক্লিওটাইড এর সজ্জারীতির মাধ্যমে মানুষের শনাক্তকরণ পদ্ধতিকে DNA finger prints বা DNA profile বলে। অন্যভাবে A pattern of bands on a gel that is unique to each individual is DNA finger print.

- **আবিষ্কারক :** বিজ্ঞানী Alec Jeffreys এবং তাঁর সহযোগীরা (Jeffreys *et al.*) ১৯৮৫ সালে DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আদালতে এ পদ্ধতিটি গৃহীত হয় ১৯৮৬ সালে।
- **DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা (Materials for DNA finger printing) :** মানুষের ক্ষেত্রে রক্তের দাগ (WBC), বীর্য, অস্থিমজ্জা, চুলের গোড়া, ত্বক ইত্যাদিতে অবস্থিত কোষ।

CamScanner

- **পরিমাণ :** ১ মাইক্রোগ্রাম টিস্যু।
- **যখন DNA finger prints একই হওয়ার সম্ভাবনা :**
  - ক্লোনিং
  - আইডেনটিক্যাল টুইন
- **বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে DNA finger print সংরক্ষণ করা হয় :**
  - NID কার্ডের জন্য
  - জমিজমা হস্তান্তর (রেজিস্ট্রি)
  - কাবিন নামা/বিবাহ (রেজিস্ট্রি)
  - মোবাইল এর সিম ক্রয়
- **প্রক্রিয়া :**

প্রথমে কোনো জীব তথা মানুষের সম্পূর্ণ DNA সংগ্রহ করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে **জেল ইলেকট্রোফোরেসিস** এর মাধ্যমে জেল স্তরের উপর চালনা করা হয়। ফলে সেখানে DNA খণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে বড় থেকে ছোট হিসেবে কতগুলো সারিবদ্ধ ব্যান্ড হিসেবে জমা হবে। বিশেষ ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যান্ডগুলোর প্রকৃতি ও পারস্পরিক অবস্থান জানা যায়।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ (Application of Genome Sequencing)

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে জানা যায় ঐ প্রজাতির DNA অণুতে অবস্থিত ATGC গুলো কোনটার পর কোনটার অবস্থান অর্থাৎ এদের অনুক্রম। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে সব অংশে ATGC একই অনুক্রমে অবস্থান করে না, কখনো কখনো একই সাথে পরপর একাধিক A বা একাধিক T থাকতে পারে। কোনো জীবের জীবন রহস্য জানার প্রথম ধাপ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং। জিনোম সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে জানা যায়– কোন জিনের কোথায় অবস্থান, গঠন, পরিধি ও কাজ। এগুলো জানতে পারলে ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

DNA ফরেনসিকস (DNA Forensics)

১. **ক. অপরাধী শনাক্তকরণে :** ভিক্টিম বা অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান থেকে আলামত সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। এর পর সন্দেহভাজন তালিকা ধরে তাদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। যার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে আলামত থেকে নেয়া সিকোয়েন্সিং এর মিল হবে সেই প্রকৃত অপরাধী। বর্তমানে আমাদের দেশে এই পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত।

খ. ধর্ষণকৃত মহিলার যোনি থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণু অথবা কাপড় ও শরীরের অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণুর DNA পরীক্ষা করে ধর্ষণকারীর রক্তের DNA-এর মিল দেখে ধর্ষণকারী শনাক্ত করা যায়।

২. **পিতৃত্ব নির্ধারণে :** অনেক সময় সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে পিতৃত্ব দাবিকৃত ব্যক্তিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিলিয়ে দেখা হয়। যার জিনোমের সাথে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিল সম্পন্ন হবে, তিনিই হবেন সন্তানের প্রকৃত পিতা।

৩. **নবজাতক শনাক্তকরণে :** হাসপাতালে যদি নবজাতক বদল হয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বদল করা হয় তবে মা এবং বাচ্চার কোষের DNA পরীক্ষা করে বাচ্চার মা শনাক্ত করা যায়।

৪. **স্বজন নির্ধারণে :** সাভারে রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনায় পরিচয়হীন শ্রমিকদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে তার সাথে তার দাবিকৃত আত্মীয়দের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে মিল পাওয়ার পর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকাও দেয়া হয়েছে।

৫. **শ্রেণিবিন্যাসে স্তর নির্ধারণ :** জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা হলো আর্কিব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকেও পৃথক, কারণ ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন অন্যান্য সকল জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক। তাই আর্কিব্যাকটেরিয়াকে পৃথক **অধিরাজ্য** (Domain) করা হয়েছে।

CamScanner

৬. **শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্যের মিল নির্ধারণে :** আর্কিব্যাকটেরিয়ার rRNA এর বেস সিকোয়েন্স ব্যাকটেরিয়ার সাথে মিল সম্পন্ন। তাই আর্কিব্যাকটেরিয়া ও ব্যাকটেরিয়া ঘনিষ্ঠতম।

আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক স্বর্ণজয়ী সাফল্য জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো নিম্নে দেখানো হলো–

১. যে কোনো প্রকৃতির জীব থেকে বিশেষ কোনো জিনকে শনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে পৃথক করা; যেমন– মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন। এটি ১১নং ক্রোমোজোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে অবস্থিত। (চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

২. উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বা প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী জিন অনুসন্ধান করা; যেমন– Bt toxin জিন **Cryl AC** এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন PDH 45 (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

৩. উদ্ভিদের মান উন্নয়নের জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন অনুসন্ধান এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে সফলভাবে ব্যবহার করা; যেমন–গোল্ডেন রাইস এর বিটা-ক্যারোটিন জিন (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

৪. জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য উদ্ভিদ বা অণুজীবের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ; যেমন– ধান, পাট, ভূট্টা ইত্যাদি ফসলের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য অন্যান্য মৌলিক গবেষণায় প্রয়োগ।

৫. গবাদি পশুর মাংস, দুধের পুষ্টি গুণাগুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে জিনোম সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৬. মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং দ্বারা মানব জিনোমের অনেক তথ্যই এখন উন্মোচিত হয়েছে, ফলে এই তথ্যসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে; যেমন–ইনসুলিন জিন–এর প্রয়োগ।

৭. যে কোনো জীবে জিনের প্রকাশ (expression of gene) কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং এ তথ্যসমূহ গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ।

৮. ভ্রূণ বা সদ্যজাত শিশুর জিনোম সিকোয়েন্সিং করে আগাম রোগ নির্ণয় করা যায়।

৯. হাসপাতালে যদি কোনো নবজাতক বদল হয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বদল করা হয় তবে মা এবং বাচ্চার কোষের DNA পরীক্ষা করে বাচ্চার মা শনাক্ত করা যায়।

১০. দুর্ঘটনায় নিহত ও বিকৃত ব্যক্তির শনাক্তকরণেও জিনোম সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করা যায়।

১১. জীবতথ্য বিদ্যার (Bioinformatics) জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিনোম সিকোয়েন্সিং উপাত্ত থেকে গ্রহণ করা।

১২. বন্য জীবজন্তু যেমন–সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে প্রজননের ক্ষেত্রে DNA সিকোয়েন্সিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১৩. এছাড়া জৈবজ্বালানী উদ্ভাবন, ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ, ইন্টারফেরন উৎপাদন ও ক্যান্সার গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিং সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

১৪. জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে টিউমার ভাইরাস শনাক্ত করে ক্যান্সার গবেষণায় অগ্রগতি আনা যায়।

১৫. জিনোম সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে উদ্ভিদের জৈব জ্বালানি উৎপাদনের জিন শনাক্ত করে জ্বালানি উৎপাদনের হার ও গুণগত মান বাড়ানো যায়।

জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তার বিধানসমূহ
(Biosafety Policies in Application of Biotechnology)

জীবনিরাপত্তার (biosafety) মূল উদ্দেশ্য হলো জীবপ্রযুক্তি প্রসূত পদার্থ ও জীবপ্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত কোনো বিপদ থেকে মানুষ ও পরিবেশকে রক্ষা করা। সংক্রামক জীবাণুর বা জীবপ্রযুক্তিপ্রাপ্ত জীবদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও গবেষণা থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার ফলে যাতে মানুষের স্বাস্থ্যহানিকর ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর ক্ষতিকারক কোনো প্রভাব তৈরি

না হয় তার ওপর সম্যক দৃষ্টি আরোপই জীবনিরাপত্তা বা জীবজ সুরক্ষা বা বায়োসেফটি (Biosafety is the avoidance of risk to human health and safety and to the conservation of the environment, as a result of the use for research and commerce of infectious of genetically modified organisms)। **মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠীকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তাকে জীবনিরাপত্তা (biosafety) বলা হয়।**

মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহারে মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি না, বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন Bt. cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে এই Bt. বেগুন মানুষের ইমিউন সিস্টেমের কোনো ক্ষতি করবে না।

জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত GMO সমূহের উপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Guidelines বলে। এ নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করা আছে। এ নির্দেশিকার মুখ্য বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।

এই Biosafety Guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি **জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি** (National Committee on Biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে **প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি** (Institutional Biosafety Committee) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও **জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি** (Biosafety Core Committee), **মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি** (Field Level Biosafety Committee) এবং **জীব নিরাপত্তা অফিসার** (Biological Safety Officer) গঠন করা হয়েছে।

Biosafety Guidelines এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

- জীবনিরাপত্তা সমুন্নত রেখে জীবপ্রযুক্তি গবেষণাকে সহজতর করা।
- জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক জীবাণুর অবমুক্ত হওয়া রোধ করা।
- জীবপ্রযুক্তিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও স্থানান্তরকরণ মনিটরিং করা।
- GMO/LMO-এর ব্যবহার বা প্রয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা। (CBP-এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে।)
- GMO/LMO ক্ষতিকারক নয় বলে প্রমাণিত হলে তবেই প্রবর্তন করা।

জীবের স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ঝুঁকি (Health Safety Risk of Living Organisms)

মানুষের সার্বিক মঙ্গলার্থে জীবপ্রযুক্তি সৃষ্টি হলেও কোনো কোনো দিক দিয়ে জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে জীবের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান। নিচে জীবের স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ঝুঁকি বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

১. জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ও এর অনিয়মিত ব্যবহারে মানুষের দেহ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

২. স্কটল্যান্ডের রওয়েট গবেষণাকেন্দ্র (Rowett Research Institute, Scotland) এক ধরনের GM আলুগাছ (Genetically Modified Potato) উদ্ভাবন করেছে। এসব গাছের আলুর মধ্যে এক ধরনের **লেকটিন** পাওয়া যায়, যা ইঁদুরের অনাক্রম্যতা নষ্ট করে ও তাদের বৃদ্ধি রোধ করে। অর্থাৎ GM আলু খাওয়ানো ইঁদুরের যকৃত আকারে ছোট ও অপুষ্ট ধরনের হয়।

CamScanner

৩. পরীক্ষাগারে যে সব মা ইঁদুরকে GM Food খাওয়ানো হয় তাদের অর্ধেক বাচ্চা ৩ সপ্তাহের মধ্যে মারা যায় GM খাদ্য খাওয়ানো ইঁদুরের শুক্রাশয়ে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

৪. ট্রান্সজেনিক জীবে অপ্রত্যাশিত প্রোটিন সৃষ্টি হয়ে তা **অ্যালার্জেন** (allergen) হিসেবে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে শিশুদের মারাত্মক অ্যালার্জির জন্য ট্রান্সজেনিক বাদাম ও কিছু GM Food কে দায়ী করা হয়।

৫. Bt Bringal (Bt বেগুন) মানুষের ইমিউন সিস্টেমের সামান্যতম ক্ষতি করে, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৬. সাধারণ জীবপ্রযুক্তিতে উৎপাদিত Bt তুলা গাছ **পেস্ট বল ওয়ার্ম** (BAll Worm) প্রতিরোধ হয়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বল ওয়ার্মও Bt টক্সিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী তৈরি করে তুলাগাছের ক্ষতি সাধন করে। ভারতে Bt তুলা উদ্ভিদের পাতা খেয়ে কয়েক হাজার ভেড়া, মহিষ ও ছাগলের মৃত্যু হয়েছিল।

৭. কিছু GM Food মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, বিশেষ করে শিশুদের **ইস্ট্রোজেন লেভেল** (estrogen level) বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৮. GM Food এর ব্যবহারে জীবদেহে বিষক্রিয়া ও পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে এবং এদের ব্যাপক ব্যবহারে খাদ্য বৈচিত্র্য হ্রাস পায় এবং খাদ্য শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়।

৯. কোনো কোনো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য **জীবন্মৃত ভাইরাস** (attenuateal virus) ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো কারণে যদি এই জীবন্মৃত ভাইরাসের মিউটেশন ঘটে ভাইরাস **ভিরুলেন্ট** (virulent) হয়ে ওঠে তবে তা মানুষের অনেক ক্ষতি করে।

ঝুঁকি নির্ধারণ

Cartagena Protocol এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। পরীক্ষাধীন GMO/LMO এর বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকারক হলে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা বিবেচনা করে ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

গবেষণাগারে GMO/LMO নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য বিধানসমূহ

১. গবেষণার মূলনীতি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে পারে।
২. দক্ষ গবেষক নিশ্চিত করতে হবে।
৩. গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তির তথ্য রাখতে হবে।
৪. নিরাপত্তা বিধান অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলো অনুসন্ধান করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে GMOs/LMOs ব্যবহার বা অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ

১. মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি রোধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
২. যে পরিবেশে এদের প্রয়োগ করা হবে তার উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করতে হবে। সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যের উপর এদের প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।
৩. GMOs/LMOs এর জেনেটিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে।
৪. কোনো GMOs/LMOs এর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ প্রমাণিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত করা যাবে না।

CamScanner

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

জীবপ্রযুক্তি : "মানবকল্যাণে জৈবিক উপকরণ তথা অণুজীব অথবা কোষীয় উপাদান এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই Biotechnology বা **জীবপ্রযুক্তি**।" The European Federation of Biotechnology (EFB, 1984) প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী "জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) হলো প্রাণরসায়ন, অণুজীববিজ্ঞান এবং প্রকৌশলী বিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগ, যা বিভিন্ন অণুজীব, আবাদকৃত টিস্যু কোষ এবং এদের অংশকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে।" টিস্যু কালচার, আণবিক জীববিজ্ঞান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনজাইম প্রকৌশলী, বায়োগ্যাস, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, টিকা ও অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন প্রভৃতি বায়োটেকনোলজির অন্তর্গত।

টিস্যু কালচার: উদ্ভিদদেহ থেকে পৃথককৃত যে কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ বা টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করে পূর্ণাঙ্গ চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করাকে টিস্যু কালচার বলে। টিস্যু কালচারে উদ্ভিদের ব্যবহৃত অঙ্গসমূহের মধ্যে রয়েছে শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, কচি পাতা, পুংধানী বা পরাগকণা, ভ্রূণ, কাণ্ডের পর্ব, ডিম্বাণু, ডিম্বকত্বক কোষ বা যে কোনো ভাজক টিস্যু। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ থেকে যে উদ্ভদাংশ পৃথক করে নেওয়া হয়, তাকে **এক্সপ্লান্ট** (explant) বলে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো জিন পৃথক করে নিয়ে অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত জীবকোষে প্রতিস্থাপন করাই হলো **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** বা **জিন প্রকৌশল**। এতে দুটি পৃথক DNA-এর অংশের সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতির DNA তৈরি হয়, যাকে বলা হয় **রিকম্বিনেন্ট DNA**। রিকম্বিনেন্ট DNA দিয়ে তৈরি নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকে বলা হয় **GMO** (Genetically Modified Organism)। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে পতঙ্গবিরোধী ভুট্টা, ভাইরাস বিরোধী পেঁপে, সুপার রাইস, ইনসুলিন প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে।

ইনসুলিন : ইনসুলিন একটি **হরমোন** যা অগ্ন্যাশয়ের **বিটা-কোষ** হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রা থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। দেহে ইনসুলিনের অভাব হলে **ডায়াবেটিস** রোগ হয়। ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো এসিড দিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন দুটি ডাই-সালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ইনসুলিন গঠন করে। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন নিঃসরণকারী জিনকে *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। ডায়াবেটিক রোগ চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হলো ইনসুলিন।

GMO : চিরাচরিত ব্রিডিং পদ্ধতির পরিবর্তে উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক এবং অণুজীবের মধ্যে জিন প্রবেশ করিয়ে যে পরিবর্তিত জীব সৃষ্টি করা হয় তাদের GMO বলে। অথবা প্রচলিত সংজ্ঞায়, গবেষণাগারে যে প্রক্রিয়ায় এক প্রজাতির জীব থেকে জিন সংগ্রহ করে সম্পর্কহীন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর জিনে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করিয়ে জিনগত পরিবর্তিত জীবের সৃষ্টি করা হয় তাকে GMO বলে। GMO সৃষ্টির সময় ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পতঙ্গ, প্রাণী, এমনকি মানুষ থেকেও বহিরাগত জিন আহরিত হতে পারে।

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট : কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কেটে **জেল ইলেকট্রোফোরেসিস** (electrophoresis) এর মাধ্যমে উক্ত DNA-এর যে ফটোগ্রাফি বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় তাকে DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট বা DNA Profile বলে। দু'জন মানুষের (ক্লোন বা অভিন্ন জমজ ছাড়া) আঙ্গুলের ছাপ (*finger print*) কখনো একরকম হয় না।

জিনোম সিকোয়েন্সিং : কোনো জীবের জিনোমস্থ DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে নিউক্লিওটাইডসমূহ (ATGC) কোন অণুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানাই হলো **জিনোম সিকোয়েন্সিং** বা **DNA সিকোয়েন্সিং**। কোনো জীবের জিনোম সিয়োয়েন্সিং সম্পূর্ণ হলে তা তার বিভিন্ন জিনের অবস্থান ও কার্যকারিতা জানা সহজ হয়। জিনের অবস্থান ও কাজ জানা গেলে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করা সম্ভব হয়।

GMO = Genetically Modified Organism; LMO = Living Modified Organism।

CamScanner

এ অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১. Biology এবং Technology শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত Biotechnology ১৯১৯ হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী **কার্ল এরেকি** প্রথম ব্যবহার করেন।

২. দশ হাজার বছরের পুরোনো Biotechnology দই, পনির, সিরকা, পাউরুটি, মদ ইত্যাদি।

৩. White Biotechnology সাধারণত শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের Biotechnology.

৪. **রিকম্বিনেন্ট** DNA Molecular Biology-এর গবেষণার ফসল।

৫. উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম সজীব কোষ বা টিস্যু বা অঙ্গ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টির ক্ষমতাকে **টোটিপোটেন্সি** বলে।

৬. উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করে টিস্যু কালচারে ব্যবহার করা হয় তাকে **এক্সপ্লান্ট** বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে **অণুচারা** (plantlet) বলে।

৭. **অ্যাগার** হচ্ছে শৈবাল থেকে প্রাপ্ত একটি স্বচ্ছ, নাইট্রোজেনমুক্ত, জিলেটিন জাতীয় পদার্থ।

৮. সাইব্রিড তৈরির প্রক্রিয়াকে **সাইব্রিডাইজেশন** বা **দেহকোষের সংকরায়ন**ও বলা হয়। সাইব্রিড তৈরিতে দুটি কোষের শুধু সাইটোপ্লাজম মিলিত হয় কিন্তু নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে না।

৯. **লেমিনার এয়ার ফ্লো** (Laminar air-flow) নামক যন্ত্রের সামনে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ তৈরী করা হয়।

১০. টিস্যু কালচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ pH ৫.৫ - ৫.৮।

১১. ১২১°C তাপে ১৫ পাউন্ড চাপে ২০ মিনিট অটোক্লেভ করে টিস্যু কালচারের জন্য medium জীবাণুমুক্ত করা হয়।

১২. **ব্যাসাল মিডিয়াম** হলো মৌলিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ পুষ্টি মাধ্যম।

১৩. মিডিয়ামে অবস্থানরত এক্সপ্লান্ট থেকে সৃষ্ট অবয়বহীন টিস্যু গুচ্ছকে **ক্যালাস** বলে।

১৪. যে কোনো আবাদী কোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** বলা হয়।

১৫. একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত জিন নিয়ে অথবা কোনো কৃত্রিম (সংশ্লেষিত) জিন নিয়ে অন্য কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করার সামগ্রিক কৌশলই **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** বা **জিন প্রকৌশল**।

১৬. দাতা DNA ও প্লাজমিড DNA একই **রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ** (restriction envooclence) এনজাইম দ্বারা কর্তন করা হয়।

১৭. ছেদনকৃত DNA খন্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) সংযুক্ত করার জন্য DNA **লাইগেজ** এনজাইম দ্বারা জোড়া লাগানো হয়।

১৮. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে ইচ্ছামাফিক জীবের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো যায়।

১৯. রেস্ট্রিকশন এনজাইম এর সংখ্যা ২৫০, একে **আণবিক কাঁচি** বলে।

২০. বাহকগুলো প্লাজমিড (plasmid), ফায ভাইরাস ও কসমিড (cosmid) এর ক্ষুদ্রাকার DNA। এর মধ্যে Plasmid ই-উত্তম।

২১. প্লাজমিড DNA ব্যাকটেরিয়ার ক্ষুদ্রাকার দ্বিসূত্র বৃত্তাকার কার্যকর DNA.

২২. কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA অণুর খণ্ডাংশকে আলাদা করে অন্য একটি জীবের DNA অণুর (পোষক DNA অণু) সঙ্গে যুক্ত করে যে নতুন ধরনের DNA অণু তৈরি করা হয় তাকে **রিকম্বিনেন্ট** DNA বলে।

২৩. যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা হয় তাকে **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি** বলে। অথবা, যে প্রযুক্তি প্রয়োগ করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে।

২৪. **বায়োরিঅ্যাক্টর** হচ্ছে এক ধরনের প্রযুক্তিগত যন্ত্র বা সিস্টেম, যা কোনো জৈবিক প্রক্রিয়া সংঘটনের জন্য সক্রিয় পরিবেশ বজায় রাখে। ট্রান্সজেনিক জীবগুলো বায়োরিঅ্যাক্টরের মতো কাজ করে।

২৫. ১৯৮৪ সালে **পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন** (Polymerase Chain Reaction, PCR) আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis আবিষ্কার করেন।

২৬. ১৯৫২ সালে Laderberg সর্বপ্রথম *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমিডের সন্ধান পান।

২৭. যে প্লাজমিডের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে টলুইন, স্যালিসাইলিক এসিড ইত্যাদি অস্বাভাবিক উপাদানের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে Degradative Plasmid বলে।

CamScanner

২৮. যে প্লাজমিডে রোগ সৃষ্টিকারী জিন থাকে তাকে **Virulance Plasmid** বলে।

২৯. বাহ্যিক পরিবেশ থেকে ব্যাকটেরিয়া কোষে (ইলেকট্রোপোরেশন বা লাইপোজোমের মাধ্যমে) রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশের প্রক্রিয়াকে **ট্রান্সফরমেশন** বলে।

৩০. ট্রান্সজেনিক ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে *E.coli, Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া অধিকহারে ব্যবহার করা হয়।

৩১. রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যাকটেরিয়াতেই তৈরি হয়। কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম হলো Bam, HI, Hind III, Eco RI ইত্যাদি।

৩২. কাঙ্ক্ষিত নতুন জিনের অন্তর্ভুক্তির ফলে সৃষ্ট নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** বলে।

৩৩. সুকেন্দ্রিক কোষে (যেমন-প্রাণিকোষে) ইচ্ছাকৃতভাবে DNA প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে **ট্রান্সফেকশন** বলে।

৩৪. যে প্রক্রিয়ায় ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত এক বা একাধিক কাঙ্ক্ষিত জিন অন্য কোনো জীবদেহে স্থানান্তর করা হয়, তাকে বলে **ট্রান্সজেনেসিস**।

৩৫. যে পদ্ধতিতে জিনগতভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহুজীব বা বহুকোষ সৃষ্টি করা হয় তার নাম **ক্লোনিং**।

৩৬. **থোমাটিন** ০.৬% সুক্রোজ দ্রবণের চেয়ে ৫,৫০০ গুণ বা স্যাকারিনের চেয়ে ৩০০ গুণ বেশী মিষ্টি।

৩৭. দুটি চেইনে মোট ৫১টি অ্যামিনো এসিড দিয়ে মানুষের **ইনসুলিন** গঠিত।

৩৮. **ইন্টারফেরন** এক প্রকার প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন যা ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

৩৯. ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দুধ, মূত্র ও রক্ত থেকে মূল্যবান প্রোটিন সংগ্রহ করা হয়।

৪০. জিন ত্রুটিজনিত কারণে রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে ত্রুটিমুক্ত জিন প্রবেশ করিয়ে রোগ নিরাময়কে বলে **জিন থেরাপি**।

৪১. রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে দিলে ওই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে **ভ্যাকসিন** বলা হয়।

৪২. কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বৃহত্তর জীবের মাধ্যমে অধিক মাত্রায় উৎপাদন প্রক্রিয়া হলো **বায়োফার্মিং** (Biopharming), যেমন ছাগলের মাধ্যমে **অ্যান্টিথ্রমবিন** উৎপাদন।

৪৩. তেল ও হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত পরিবর্তন করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া।

৪৪. *E.coli* ও ঈষ্ট থেকে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা হয়।

৪৫. ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Alec Issacs** এবং **Jcan Lindenmann** সর্বপ্রথম ১৯৫৭ খ্রি: **ইন্টারফেরন** আবিষ্কার করেন।

৪৬. প্লাস্টিক শিল্পকারখানায় তেল জাতীয় হাইড্রোকার্বন যেমন– ইথিলিন ও প্রোপাইলিন ব্যবহার করা হয়।

৪৭. ক্যান্সার, ভাইরাস সংক্রমণ, বিপাক সমস্যা এবং প্রদাহজনিত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো RNA ব্যবহৃত হয়।

৪৮. কোনো জীবকোষে অবস্থিত **জিনসমষ্টিকে** ঐ জীবকোষ তথা ঐ জীবের **জিনোম** বলা হয়।

৪৯. একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের **মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট** বলা হয়।

৫০. কোনো DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলোর অনুক্রমিক সাজানো পদ্ধতি হলো ঐ DNA অণুর **জিনোম সিয়োয়েন্স**। কোনো DNA অণুর জিনোম সিকোয়েন্স উদঘাটন পদ্ধতি হলো **জিনোম সিকোয়েন্সিং**।

৫১. **ক্যান্সার** গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিং দ্রুত ও সফল ভূমিকা রাখে।

৫২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে বায়ো ইনফরমেটিকস-এর মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণায় দ্রুত উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

৫৩. বাংলাদেশী বিজ্ঞানী **ড. মাকসুদুল হক** (এখন প্রয়াত) ও তাঁর সহযোগীরা **তোষা পাটের** (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিয়োয়েন্সিং করেন, যাতে বেসপেয়ার আছে ১২০ কোটি।

৫৪. কোনো জীবের DNA কে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলে জেল-এ যে সুনির্দিষ্ট ব্যান্ড প্যাটার্ণ সৃষ্টি হয় তাকে DNA **ফিংগারপ্রিন্ট** বলা হয়। হাতে আঙ্গুলের ছাপের মতোই DNA ফিংগারপ্রিন্ট কোনো ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয়। একে DNA **প্রোফাইল**ও বলা হয়।

CamScanner